পঞ্চম অধ্যায়

বেগম রোকেয়া সাখোয়াৎ হোসেনের কর্মধারা

পঞ্চম অধ্যায়

বেগম রোকেয়া সাখোয়াৎ হোসেনের কর্মধারা

বেগম রোকেয়া সাখোয়াৎ হোসেনের কর্মধারার মূল শক্তি ছিল নারীশিক্ষা ও নারীর সচেতনতার দিক নির্ণয় করা। তাই প্রথমেই নারীশিক্ষায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের অবস্থানটি দেখে নেওয়া যেতে পারে।

ভারতবর্ষে নারীর পশ্চাদপদ অবস্থান থেকে নারীমুক্তি-ভাবনার প্রথম সূর্যোদয় ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্বে। শিল্পবিপ্লবের হাত ধরে এল মানবতাবাদী চেতনা। সেই চেতনাই পরিণত হয় সংস্কারবাদে। এতদিনে পুরুষ উপলব্ধি করেছে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত এক অন্ধকার জগতে বন্দী নারীসমাজ। অর্থাৎ নারীর মানবেতর অবস্থানটি সেদিনের সমাজকে প্রবলভাবে ধাক্কা দিল। ভারতীয় হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্ম-খৃষ্টান ভাবনার প্রভাব পড়াতে ব্রাহ্ম মহিলাদের সঙ্গে হিন্দু রমণীরাও একটু একটু করে শিক্ষার খোলা আঙিনায় এসে দাঁড়াতে শুরু করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে যে বাঙালী সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল তার সমর্থন পাওয়া যায় 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায়। — 'ইদানীন্তন বিদ্যাবতী অনেক স্থানে অনেক স্ত্রী আছেন। এই কলিকাতা মহানগরের মধ্যে ভাগ্যবান লোকদিগের অনেক স্ত্রী প্রায় লেখাপড়া জানেন।" *(সমাচার দর্পণ, ১৩ই এপ্রিল, ১৮২২, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খণ্ড), কলিকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ)* সেই লেখাপড়া তাদের কাজে লাগে গৃহে ধর্মগ্রন্থ পাঠ বা সংসারের জমা খরচের হিসাব রাখার জন্য। নারীশিক্ষার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৈষ্ণবী ও মেম দ্বারা গৃহের অভ্যন্তরে নারীর শিক্ষার প্রথম পাঠের চল ছিল হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই মিস অ্যান কুক (১৮২১ সালে কলকাতায় আগমন), লেডিজ সোসাইটির সদস্যবৃন্দের উদ্যোগে নারীশিক্ষার বিকাশ হতে থাকে — তা ইতিহাস সমর্থিত। ১৮২২ সালে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' পুস্তিকা লিখে নারীশিক্ষার সপক্ষে প্রথম যাত্রা শুরু করলেন। সেই যাত্রাপথে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (১৭৯৯-১৮৫৯), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৫৫), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮), মদনমোহন

তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৭৫) ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ এসে মিলিত হলেন এবং নারীশিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন ১৮৪৮ সালে 'বেথুন স্কুলে'র দ্বার উন্মোচন পর্ব পর্যন্ত। এরপর থেকে যে ইতিহাস তা হিন্দু-ব্রাহ্ম নারী সম্প্রদায়ের এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। এই সময়কালে মুসলিম সম্প্রদায় ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিধা অতিক্রম করতে পারেনি। অথচ এই সমস্ত ঘটনাবলীর মাত্র এক শতাব্দী পূর্বেও ভারতবর্ষের শাসক ছিল মুসলমানরা। মুসলিম শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের হিন্দু সম্প্রদায় বৃটিশ শাসকদের স্বাগত জানাল। শিক্ষায়-কর্মে-ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠল এক নূতন সম্প্রদায় — শিক্ষিত সচেতন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। রাজ্য ও ভাষা হারানোর বেদনায় আপ্লুত মুসলিম সম্প্রদায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে লাগল। শিক্ষাহীনতা, অবরোধ প্রথা, কূপমন্ডুকতা পায়ে পায়ে জড়ানো ছিল মুসলিম সমাজে। অন্যদিকে সংস্কারবাদী ও জাতীয়তাবাদী চেতনা সেদিন হিন্দু সম্প্রদায়কে বেশ কয়েক যোজন পথ এগিয়ে দিয়েছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের থেকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাট-সত্তরের দশকে হিন্দু নারীরা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, সভাসমিতি স্থাপন, কর্মে নিযুক্তি, শিক্ষার জন্য বা বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য বিদেশ যাত্রা, জাতীয় আন্দোলনে পথে নেমে আসার মধ্য দিয়ে যোগদান করে একটি স্বতন্ত্র সংঘবদ্ধ চেতনার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের জীবন একসূত্রে বাধা থাকলেও মুসলমানের ভাগ্যান্বেষণের পালা শুরু হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগধর্মের বৈশিষ্ট্য ও সেই সূত্র ধরে সমাজ-মানসের রূপান্তর ঘটল। মন ও মনন, চিন্তা ও চেতনা, ধ্যান-ধারণায় সেই রূপান্তরিত যুগধর্মের প্রভাব পড়তে লাগল মুসলিম সমাজে। লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৮ সালে 'নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন' প্রণয়ন করায় ও মুসলমান সমাজের দলিলপত্র ঠিকমত না রাখায় তারা ভূমিহীন হয়ে পড়ে। তদুপরি রাজভাষা এখন ইংরেজী হওয়ায় হিন্দুদের মত মুসলমান সমাজ সেই ইংরেজী শিক্ষা প্রথমে গ্রহণ করতে নিমরাজী ছিল। অবস্থাটা এমন ছিল যে "ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির চারজন মুসলমান সদস্যের একজনও ইংরেজি জানতেন না। ... দরিদ্র বাঙালি হিন্দু ঘরের ছেলেরা যখন ইংরেজি শেখার সুযোগের জন্য হেয়ার সাহেবের পালকির সঙ্গে দৌড়চ্ছে, বাঙালি মুসলমান সমাজ তখন পরিবর্তিত যুগের কথা চিন্তা না করে অতীত স্মৃতি

রোমন্থনেই ব্যস্ত।" *(পৃ: ২০০, স্বপন বসু, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৯৭৫, ১ম সংস্করণ)* ১৮৩০ সালে শুধু ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির সরকারি সাহায্য, ১৮৩৫ সালে শিক্ষা সংক্রান্ত আইন, ১৮৩৭ সালে রাজভাষার পরিবর্তন, ১৮৪৪ সালে চাকরী ক্ষেত্রে নূতন নিয়োগ পদ্ধতির প্রয়োগ — এইসব বাধা কাটিয়ে মুহ্যমান মুসলিম সমাজের কান্ডারী হলেন আবদুল লতিফ, যিনি ১৮৪৯ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিত হন।

পুরুষ সমাজ শিক্ষা দিয়ে দ্বিধাগ্রস্থ, সেই সমাজে ১৮২২ সালে মিশনারী মিস কুকের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে একজন মুসলিম রমণীর অক্লান্ত প্রয়াসের কথা জানা যায় পৃ: ২১৩, বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, কলিকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৮৪ (প্রথম সংখ্যা) গ্রন্থটিতে। এটি নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। ১৮৫৫ সালে কলকাতায় স্থাপিত হল 'আঞ্জুমানে ইসলামী' বা 'মহমেডান এসোসিয়েশন'। কিন্তু নারীশিক্ষাকে সমাজ মেনে নিয়েছে আরও পরে। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'মহমেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে' সৈয়দ আমীর আলী স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টি মেনে নিলেন। সৈয়দ আহমেদ হোসেন (১৮৭০-১৯৩৪) বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির অনুষ্ঠান পত্রে (১৯০৩) স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন, "আমাদের সমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করাও শিক্ষা সমিতির এক প্রধান উদ্দেশ্য।" *(পৃ: ৪১৮, ইসলাম প্রচারক, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩১০; তথ্যঋণ : ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭ প্রথম পুনর্মুদ্রণ)* স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র দ্বারা অন্তঃপুরে শিক্ষা, মুক্ত বিদ্যালয় স্থাপন নারীশিক্ষাকে যেমন এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সমসাময়িককালের সওগাত (১৯৫২), ইসলাম প্রচারক (১৮৯১), মিহির ও সুধাকর (১৮৯৫), নবনূর (১৯০৩), দি মুসলমান ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় নারীশিক্ষার সপক্ষে জনমত গড়ে উঠেছিল। সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রতিফলিত মুসলমান জনমত থেকে অনুমান করা যায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। বিশেষ করে রোকেয়ার সমসাময়িক সাহিত্যিক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) নারীজাতির নিরক্ষরতাকেই সমাজের সর্বাধিক দুর্বলতা বলে চিহ্নিত করেছেন। *(ভূমিকা পৃ: ৩৭, আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*

১৮৩১-১৯৩০, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৬৯ ১ম সংস্করণ।) সমসাময়িক কালের মুসলিম লেখক-লেখিকাদের মধ্যে মহাম্মদ ওয়াজেদ আলি 'আধুনিক মহিলা' তৈরি করার কথা বলেও স্ত্রী-পুরুষ সমান হলে যে গৃহজীবন (family life) নষ্ট হয়ে যাবে সে বিষয়ে মত পোষণ করেন। সৈয়দ জয়নাব খাতুন নারীশিক্ষার কথা বললেও নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলেন নি। এদিক থেকে রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী বিদ্রোহী — তাই তিনি বলেছেন, আল্লাহতালার সৃষ্ট সব জিনিসেই সবার সমানাধিকার। কাসেমা খাতুন জানিয়েছেন পুরুষের শিক্ষাহীনতা নারী জাতির অশেষ দুর্ভোগের কারণ। অর্থাৎ শিক্ষা যদি তা গৃহশিক্ষা বা ইসলামী আদর্শের শিক্ষাও হয়ে থাকে, মোটামুটিভাবে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি এবার সমাজের বিবেচনাধীন হয়েছে। আয়েষা আহমেদ মহিলাদের কর্মসংস্থানের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আধুনিক মনের পরিচয় রেখেছেন। ফজিলতুন্নেসা খাতুন শিক্ষা ও জ্ঞানকে নারীর অস্ত্র বলেছেন, "ওমদাতুন্নেসার কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর — "যে সকল মোল্লা স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে ফতেয়া দিয়া আমাদিগকে ইংরেজী ও বাঙালী ভাষা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া আমাদিগকে চির মূর্খ করিয়া রাখিতেছে, ভারতের বিশ লক্ষ মুসলিম ললনাকে অবরোধ কারার বন্দী করিয়া রাখিয়াছে ... আমরা তাহাদের উচ্ছেদ কামনা করি।" *(ওমদাতুন্নেসা খাতুন, কোন মৌল্লায় অভক্তি, সওগাত, পত্র, ১৩৩৬; তথ্যঋণ : পৃ: ১৬-১৮, শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক সম্পাদনা, জেনানা মহফিল বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের নির্বাচিত রচনা, ১৯০৪-১৯৩৮, স্ত্রী প্রকাশনা, ১৯৯৮, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ)* প্রায় একই সময় নুরুন্নেসা খাতুন নামে এক লেখিকা ১৯১৯ সালে 'সওগাত' পত্রিকায় 'নারীজাতির শিক্ষা' প্রবন্ধে মুসলিম নারীর জন্য যতদিন না পৃথক স্কুলের ব্যবস্থা না হয় ততদিন তাদের গৃহশিক্ষার কথা বলেছেন। ১৯২৭ সালে রহিমা খাতুন মিলকি 'সওগাত' পত্রিকায় লেখেন যে মুসলিম রমণীদের ইসলামী ধ্যানধারণা বর্জিত শিক্ষা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। ঐ একই সময় বেগম ফতেমা লোহানী মেয়েদের বাড়ির বাইরে গিয়ে লেখাপড়াকে ভালভাবে গ্রহণ করেন নি। বরং বলেছেন সেলাই, সূচিশিল্প ইত্যাদি শিক্ষাই তাদের পক্ষে কল্যাণকর।

সমগ্র নারী সমাজের শোষণ ও বৈষম্যের প্রতিবাদে নারীকে জাগতে গেলে প্রথমেই দরকার শিক্ষা। সেকালের অন্যান্য মুসলমান মহিলাদের তুলনায় রোকেয়ার সচেতনতা

ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রকৃত ইসলামীয় আদর্শ বিচ্যুত নারীর অবরোধ ও নির্যাতনের অশ্রুতে সিক্ত যে মুসলিম নারীসমাজ তাকে নারীর মর্যাদা, অধিকার, শিক্ষা ও সচেতনতা দান করতে, তার বেদনাকে হৃদয়ঙ্গম করে অশ্রুমোচনের গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন কোন পুরুষ নয়, বেগম রোকেয়া একা, একক এক নারী। সেই গভীর তমসাবৃত কালে আশার ও একইসঙ্গে জাগরণের সোনার কাঠি তিনি ছুঁইয়ে দিয়ে মুসলমান সমাজের নারী মুক্তি চেয়েছিলেন। স্থানু মুসলমান সমাজকে গতিময় করার কর্মযজ্ঞে ঋত্বিক হলেন বেগম রোকেয়া। তাঁর কর্মজীবন যেন দুটি নদীর সঙ্গমস্থল। একদিকে রয়েছে নারীশিক্ষা অন্যদিকে রয়েছে সমাজ সেবা ও নারীর উন্নয়ন। নারীশিক্ষা ও সমাজ সেবা এই দুটি কর্মের মেলবন্ধন হল পারম্পরিক সাহিত্যচর্চা। নারীজাগরণ ও বাঙালী মুসলমানের জাগরণ ছিল রোকেয়া কর্মধারার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাঁর কর্মজগতকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় —

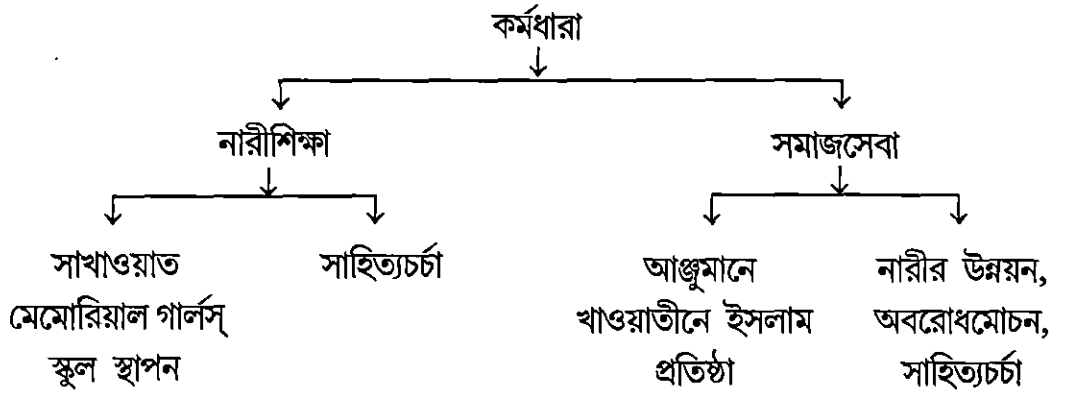

তাই তিনি উপলব্ধি করেন নারীকে জাগাতে গেলে সমাজকে জাগাতে হবে। তার জন্য সাহিত্যচর্চা হল একমাত্র মাধ্যম যা তার ভাবনায় সমাজকে প্রভাবিত করতে পারবে। ১৯০৪ সাল থেকেই একেবারে ভিন্নধর্মী এবং বিপ্লবী চিন্তার সন্ধান পাওয়া যায় বেগম রোকেয়ার সাহিত্যচর্চায়। এই উপমহাদেশে তিনি প্রথম নারী যিনি নারীর বিষয়কে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয় পটভূমিতে নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। একটি রক্ষণশীল, ঐতিহ্যিক পরিবার থেকে উঠে এসেছেন এমন একজন নারী যিনি তার সমস্ত জীবন দিয়ে নারীর শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার কথা, সার্বিকভাবে নারীমুক্তির কথা ভেবেছিলেন। তাঁর কর্মধারা বিশ্লেষণ করলে মূলতঃ তিনটি ধারার মিলিত রূপ দেখতে পাই — ক) তাঁর সাহিত্য-সাধনা, খ) তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুল গ) তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রথম মুসলিম মহিলা

সংগঠন। প্রতিকূল সামাজিক-পারিবারিক পরিবেশের উজান স্রোতে পাড়ি দিয়ে নারী সমাজের জন্য তুলে এনেছেন সেই অরূপ রতন তা হল নারীর শিক্ষা। শিক্ষা সচেতন করার জন্য সমাজকে বোঝানোর জন্য একদিকে তাঁর লেখনী স্ফূরিত হয়েছে, অন্যদিকে নারীকে মানবিক মর্যাদাদানের জন্য তার অবরোধ মুক্তির জন্য রোকেয়ার লেখনী ক্ষুরধার হয়েছে। এই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই তাঁর সাহিত্য সাধনা। তাই সাহিত্যিক রোকেয়ার মধ্যে অন্বেষণ করতে হয় নারীমুক্তির যোদ্ধা রোকেয়াকে। পুরুষ নারীর বাইরের জগতকেই শুধু নয়, নিয়ন্ত্রণ করেছে তার মনোজগতকেও। পিতৃতন্ত্রে পিতাই হলেন কুলপতি। পুরুষ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ যুক্তি ও দৃষ্টান্তসহ আলোচিত হয়েছে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে। পিতৃতন্ত্র নিজের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করার জন্য আশ্রয় নেয় সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায়। আর এই প্রক্রিয়ায় বর্তমান থেকে পিতৃতন্ত্রের অন্যায় অনুশাসন নারীকে নীরবে মান্য করতে হয়। তার ফলে তৈরি হয় সমাজে নারী-পুরুষের দুই মেরুতে অবস্থানের প্রক্রিয়া। এইসব দীর্ঘস্থায়ী ও প্রায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে রোকেয়া সাহিত্যচর্চায় আঘাত হেনেছেন। হাজার হাজার বছর ধরে পুরুষের তৈরি নারীর ভাবমূর্তিকে তিনি যুক্তি পরম্পরায় ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন। আঘাত আসবে জেনেও তিনি নারীর নিজস্ব স্থান নির্দেশ করতে এগিয়ে এসেছেন। পিতৃতন্ত্র নামক সংস্থাটিকে তিনি নাড়া দিতে চেয়েছেন, নারীর শৃঙ্খলিত জীবন থেকে তাঁকে বাইরে আনতে চেয়েছেন। হিন্দুশাস্ত্রে মনু তাঁর শ্লোকের পর শ্লোক গেঁথে স্বামীকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করে নারীকে পায়ের তলায় রেখেছেন। ইসলামে তো দুটি নারীকে একটি নরের সমান বলে নারীকে পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট ভাবা হয়েছে। কোন ধর্মেই নারীকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। নারীর জন্য একটি পুরুষ সে হল স্বামী। আর স্বামী বা পুরুষের জন্য বহুনারীর বিধান দিয়েছে শাস্ত্র, কি হিন্দু কি ইসলাম ধর্মে। এই যে নারীকে নিয়ে পুরুষের যথেচ্ছাচার, এই যে বৈবাহিক সম্পর্কের নামে নারী পীড়ন, এই যে শিক্ষার দুয়ার জোর করে বন্ধ করে রাখা, এইসব কিছুর মধ্যে রয়েছে পুরুষ আধিপত্যবাদের দম্ভ। যুগ যুগ ধরে নারী সহিষ্ণুতার পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু মুসলিম সমাজে নারীর জন্য সংবেদনশীলতা সমাজ দেখায় নি। এইসব যুগ সঞ্চিত ক্ষোভ যেন সংহত হয়ে বেগম রোকেয়ার লেখনীতে অগ্নিবর্ষণ করেছে। তাই তিনি সমাজে নারীর পেলব, কোমল,

নবনীনিন্দিত রূপকে ভেঙ্গে নূতন মানবী রূপ দিতে চেয়েছেন। নারীমুক্তির সেই পথের পাথেয় হয়েছে তাঁর সাহিত্য। রোকেয়া রচিত সাহিত্য তাঁর রচনাবলীতে গ্রন্থিত হয়েছে এইভাবে — মতিচূর (প্রথম খণ্ড), মতিচূর (দ্বিতীয় খণ্ড), সুলতানার স্বপ্ন, পদ্মরাগ, অবরোধ-বাসিনী, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ছোটগল্প ও রসরচনা, কবিতা, সুলতানার স্বপ্নের ইংরেজী অনুবাদ Sultana's Dream, ইংরেজী প্রবন্ধ ও পত্রাবলী। তাঁর সাহিত্য সাধনার কাল ১৯০১-৩২ সাল। তাঁর লেখনীতে তিনি নারীর পারিবারিক পরিমন্ডলে তার শিক্ষার অধিকার পুরুষের পাশে যোগ্য সহধর্মিনীর অধিকার, স্বনির্ভরতার অধিকার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার অধিকার, একটি উন্নত নারী জীবন গড়ে তোলার অধিকারের কথা লিখেছেন। তাঁর লেখনীতে বিপন্ন নারীকে তিনি সাহস যুগিয়েছেন, অসহায়কে সহায় বা পরিত্রাণের পথ দেখিয়েছেন, নারী সমাজকে তিনি কর্মভূমিতে আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁদের আত্মসচেতনতার কথা বলেছেন, এবং কর্মযজ্ঞের যে যে কাজে পুরুষের অধিকার, সেই সব কাজে নারীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সর্বোপরি তিনি পুরুষের সমান অধিকার দাবী করেছেন। জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা পুরুষের অপেক্ষা নারীর মনে প্রথম উদয় হয় বলে জ্ঞানবৃক্ষের ফলটি নারী-ই প্রথম ভক্ষণ করেন — বলে তিনি পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীকে আয়ুধ বা সমরাস্ত্রের মত ব্যবহার করেছেন। হিন্দু ব্রাহ্ম সমাজে রামমোহন-বিদ্যাসাগর রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও তাঁদের পথে সাথী, সহযাত্রী পেয়েছিলেন। কিন্তু বেগম রোকেয়ার একক প্রচেষ্টাকে মুসলিম নারী সমাজ সেদিন অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্তির আস্বাদ পেতে শুরু করে। তাঁর সাহিত্য-চর্চা নিয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে।

শিক্ষার অভাব নারীজাতির অবনতি ও অধঃপতনের মূল কারণ বলে মুসলিম রমণী বেগম রোকেয়ার প্রথম উপলব্ধি। আর তাই নারীশিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি একক প্রয়াসে স্থাপন করলেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ে শিক্ষার চালচিত্রটি যেমন ছিল তা দেখা যাক। ১৮৭৩ সালে সৈয়দ আহমেদ আলিগড়ে 'মুসলিম অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' স্থাপন করেন। ঐ সালেই কুমিল্লায় ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর প্রচেষ্টায় 'ফয়জুন্নেসা উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে ছাত্রীদের থাকার সুবিধার কথা ভেবে

তিনি ছাত্রী আবাসও স্থাপন করেন। কিন্তু মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার দুর্দশার চরম উদাহরণ এই যে ১৯০২ সালে পর্যন্ত ফয়জুন্নেসার স্কুলে একজনও মুসলমান ছাত্রী ছিল না বলে জানা যায়। ১৮৯৩ সালে তিনি 'ফয়জুন্নেসা জেনানা হাসপাতাল'ও স্থাপন করেন। সেদিক থেকে জমিদার নন্দিনী ও জমিদার পত্নী ফয়জুন্নেসার অসামান্য অবদান সমাজকে সমৃদ্ধ করলেও তিনি বেগম রোকেয়ার মত নারীশিক্ষাকে ব্যাপ্তি দানের ব্যাপকভাবে লেখনী ধারণ করেন নি। সেক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে নবাব ফয়জুন্নেসা এগিয়ে থাকলেও রোকেয়ার স্কুল কলকাতাকেন্দ্রিক হওয়ায় ও নানা কর্মকান্ডের সঙ্গে রোকেয়ার সংযুক্তি 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলটি'কে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের আনুকূল্যে ১৮৪৯ সালের বেথুন স্কুল, মুসলিম নারীর জন্য ১৮৭৮ সালের ইডেন গার্লস স্কুল এবং ১৮৯৭ সালে মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতায় বালিকা মাদ্রাসা বেগম শামসি ফেরদৌসী মহলের ও ১৯০৯ সালে খুজিস্তা আখতার বানুর উদ্যোগে সোহরাওর্দীয়া বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কথা আগেই জেনেছি।

১৮৮০ সালে 'বামাবোধিনী' পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয় — সে সময় ঢাকার ইডেন স্কুলে ১৫০ জন ছাত্রী পড়ত, এদের মধ্যে মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১। *(পৃ: ১৬৮-৬৯, ভারতী রায় (সম্পাদিত) সেকালের স্ত্রীশিক্ষা : বামাবোধিনী পত্রিকা, কলিকাতার উইমেন স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭।)* বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) সময় পূর্ববঙ্গে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩। ১৯১১ তে বেড়ে হয় ৫। *(পৃ: ৩৪৬, শীলা বসু : বাংলার মুসলিম নারীশিক্ষার বিকাশ; ইতিহাসে অনুসন্ধান, ৪র্থ খণ্ড গৌতম চট্টো: সম্পাদিত কলি: কে. পি. বাগচী, ১৯৮৯।)*

সরকারী প্রচেষ্টায় ১৯১২-১৩ সালে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করলেও তাতে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতি হয়নি। কারণ পর্দাপ্রথাকে লঙঘন করে মেয়েদের সহশিক্ষার জন্য মাদ্রাসায় পাঠাতে সমাজ রাজি ছিল না। পরিবর্তে মক্তবে পাঠাতে রাজি ছিল — কারণ পর্দায় তাতে ব্যাঘাত ঘটত না। "বিংশ শতাব্দীর প্রথম দ্বিতীয় দশকগুলিতেও মুসলিম সম্প্রদায় ধর্মের কারণে মেয়েদের পর্দানসীন করে রাখতে বাধ্য হত।" *(পৃ: ২২, কাজী আব্দুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, কলকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫৬)* সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সেকালের নারীদের একক প্রচেষ্টায় কয়েকটি মুসলিম

বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও সমাজে নারীর শিক্ষার চিত্র বিশেষ বদল হয়নি। এর জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির জন্য।

রোকেয়ার কর্মধারার দ্বিতীয় ভাগের সূচনা স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের জীবনাবসানের পর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিহারের ভাগলপুরে ১৯০৯ সালের ১লা অক্টোবর মাত্র ৫টি ছাত্রী নিয়ে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ শাহ আবদুল মালেকের গোলকুঠির সরকারী আবাসনে প্রথম 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুলে'র সূচনা ১৯০৯ সালে। ভাগলপুরের স্কুলের প্রথম চারটি ছাত্রীর নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন —

ছাত্রীর নাম	অভিভাবকের নাম
১) সৈয়দ কানিজ ফতেমা	সৈয়দ শাহ আবদুল মালেক
২) সৈয়দা আমাতুন জোহরা	
৩) সৈয়দা খাতুন	
৪) সৈয়দা আহসানা খাতুন	
৫) অজ্ঞাত	

স্বামীর দান দশ হাজার টাকা সম্বল করে তাঁর এ কর্মধারার প্রথম সূচনা। পরে তাঁর সতীন কন্যা ও জামাতার সঙ্গে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের কারণে তিনি ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হন। এবার নূতন উদ্যমে ১৯১১ সালের ১৬ই মার্চ ১৩ নং ওয়ালিউল্লাহ রোডে ৮ জন ছাত্রী ও ২টি বেঞ্চ নিয়ে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' স্থাপন করেন। 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুলে'র প্রথম বর্ষের ৮ জন ছাত্রীদের তালিকা ও অভিভাবকের নামসহ নিম্নে দেওয়া হল —

ছাত্রীর নাম	অভিভাবকের নাম
১) আখতারুন্নেসা	সৈয়দ আহমদ আলী (বিদ্যালয় সেক্রেটারী)
২) জোহরা	মওলানা মোহাম্মদ আলি
৩) মোনা	
৪) সৈয়দ কানিজ ফাতেমা	সৈয়দ আবদুস সালেক
৫) সৈয়দ সাকিনা	

৬) জানি বেগম ড. ওহাব

৭) রাজিনা খাতুন আব্দুর রব

৮) অজ্ঞাত

স্বামী সাখোয়াত হোসেনের দেওয়া ১০ হাজার টাকায় স্ত্রী মিসেস রোকেয়া বেগমকে ট্রাস্টি মনোনীত করে এবং ব্যারিস্টার সৈয়দ আহমেদ আলীকে সেক্রেটারী নির্বাচন করে একটি পরিচালন সমিতি গঠন করেন তিনি। এবং সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় দাতা 'সাখাওয়াত হোসেনে'র নামেই স্কুলটি পরিচিত হবে। দুর্ভাগ্য তাঁর নিত্যসঙ্গী, তাই এই মহান কাজেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। মারওয়াড়ী ব্যাঙ্ক থেকে বার্মা ব্যাঙ্কে টাকা স্থানান্তরিত করার পর ব্যাঙ্ক ফেল হয়, সেই অবস্থায় আর্থিক অনটন ও সমাজের বাধা-কুৎসা-মিথ্যে অভিযোগের পাহাড় প্রমাণ বেদনা নিয়ে তিনি একাই পথ চলতে লাগলেন। তাই স্কুল চালাতে জনগণের সাহায্যের প্রয়োজন হল। জনসাধারণের কাছ থেকে স্কুল সাহায্য পেয়েছে "প্রথম বোম্বের পরলোকগত মিঃ মালাবারী ও তারপরই কলকাতার মরহুম নওয়াব বদরুদ্দিন হায়দারের কাছ থেকে। পরের বছর (১৯১২) মিঃ মালাবারী হিজ হাইনেস দি আগা খানের কাছ থেকে স্কুলের জন্য ৩০০্ টাকা সাহায্য সংগ্রহ করেন এবং লেডী হার্ডিঞ্জের মারফত আবার ৩০্ টাকা পাঠান ... শ্রদ্ধেয় স্যার এ. কে. গজনভী ১৯১১ খ্রি. নভেম্বর থেকে ১৯১২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি মাসে ১০ টাকা করে দিয়েছেন।" *(পৃ: ৫৬, মোশ্‌ফেকা মাহমুদ, পত্রে রোকেয়া পরিচিতি, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা ১৯৯৬)* ১৯১১ সালে স্কুলের প্রতিষ্ঠা, ১৯১২ সালে মাতৃবিয়োগ। কিন্তু তাঁর কাজ থেমে যায় নি। স্কুলের বাস কেনার জন্য তিনি তাঁর সংগ্রহের কিছু বই বিক্রি করে দেবার জন্য বিজ্ঞাপন দিলে দেখা গেল পুরো রমজান মাসে মাত্র ছয় টাকার বই বিক্রি হয়েছে। হার তিনি মানবেন না এই দুর্জয় পণ নিয়ে তাঁর যাত্রা। তাই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে ৩০ হাজার টাকা স্কুলের জন্য দান করেন। সেইসময় তাঁর কর্মকাণ্ডের বিরোধিতাও যেমন হয়েছিল তেমনি অনেক সহৃদয় ব্যক্তি তাঁর পাশে এসেও দাঁড়িয়েছিলেন। অনারেবল শরফুদ্দিন, অনারেবল সৈয়দ শামসুল হুদা, অনারেবল এ. কে. গজনভী, জনাব মাহবুব আলী, মুহাম্মদ সুলতান আহমেদ, মৌলবী এম. এস. আবদুল বারী প্রমুখ ব্যক্তি আর্থিক সহায়তা দান করেন। তাছাড়া সেই দুর্দিনে তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে

দিয়েছিলেন কলকাতার প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় — যেমন জজ আমিন মহম্মদ, জনৈক অবাঙালি জি. এম. কাসেমী, ভূপালের বেগম সুলতান জাহান, মিসেস পি. কে. রায়, মিসেস হাকাম, মিসেস সাকিনা চৌধুরী, দুই বড়লাটের পত্নী লেডি চেমস্‌ফোর্ড ও লেডি কারমাইকেল প্রমুখ বিশিষ্ট মহিলাবৃন্দ।

পরবর্তীকালে মোহসেনা রহমানকে লিখিত পত্রে *(পৃ: ৫১২, রোকেয়া রচনাবলী)* যাতে স্কুলের প্রতি মমতাময়ী জননীর মত আঁচল পেতে দিয়েছেন সামান্য সাহায্যের জন্য তার প্রমাণ মেলে, "আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন .. তোমার প্রেরিত কাসন্দ পেয়ে সুখী হয়েছি। বুয়া! তুমি কাসন্দ না দিয়ে যদি স্কুল ফ্রান্ডে চার পাঁচটি টাকা পাঠাতে তা'তে আমি বেশী সুখী হতুম।" সুদূর রেঙ্গুন থেকেও স্কুলের জন্য চাঁদা এসেছে '২৭ (টাকা)' ও '৬৯ টাকা' — তাও ঐ পত্রে উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি ১৯২৬ সালে ৫ই জানুয়ারীতে মরিয়ম রশীদকে যে পত্রটি লেখেন, তাতে আর্থিক দুর্গতি ও বাংলাদেশের মুসলমানদের স্কুলের সাহায্য বিষয়ে অনুদারতা ও তাঁর ব্যথার কথা লিখেছিলেন। "আলীগড়ে মাত্র তিনদিন ছিলাম ... (অর্থাৎ নারী কূলের সাহায্য) নামে সমিতি গঠনের জন্য জনৈক (সম্ভবত অতি দরিদ্র) মহিলা হাতের আংটি খুলিয়া চাঁদার জন্য দিলেন। ... আর আমাদের বাংলাদেশ — আহারে! সে কথা না বলাই ভাল।" *(পৃ: ৫১০, পত্র সংখ্যা ৩, ঐ)*

১৯১১ সালে স্কুলের যাত্রা, ছাত্রী সংখ্যা ৮, ১৯১২ সালে ছাত্রী সংখ্যা ২৭, ১৯১৩ সালে ৩০ জন ছাত্রী ছিল। ১৯১৩ সালে স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে স্কুলটিকে ১৩ নম্বর ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেনে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯১৫ সালে ৮৪ জন ছাত্রী হওয়ায় স্কুলটি আবার স্থানান্তরিত হয়ে যায় — ৮৬/এ, লোয়ার সার্কুলার রোডের ঠিকানায়। ১৯৬৮ সালে স্কুলটি লর্ড সিন্‌হা রোডের নবনির্মিত বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়েছে যা আজ শতবর্ষের আলোয় উদ্ভাসিত। নিদারুণ প্রতিকূলতা, আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে দিয়েও অপরিসীম ধৈর্য নিয়ে রোকেয়া গড়ে তুললেন স্কুলের জয়যাত্রার পথ, একক চেষ্টায় স্কুলটিকে ঘিরে শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুললেন।

'মন্ত্রের সাধন নয় শরীর পাতন' এই প্রবাদ বাক্যটি রোকেয়ার জীবনে সর্বৈব সত্য হয়ে উঠেছিল। এই স্কুলের জন্য তাঁর হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, দিনরাতকে এক করে ফেলার কথা চাচাতো বোন মরিয়মকে লেখা ১৯১৫ সালে ৮ই সেপ্টেম্বরের পত্র থেকে জানা

যায় — "বুঝিতেই পার এখন খোদার ফজলে পাঁচটি ক্লাস এবং ৭০টি ছোট বড় মেয়ে, দু'খানা গাড়ী, দুই জোড়া ঘোড়া, সইস, কোচম্যান ইত্যাদি ইত্যাদি সব দিক একা আমাকেই দৃষ্টি রাখিতে হয়।" *(পৃ: ৫০৯, ১নং পত্র, রোকেয়া রচনাবলী)* ধীরে ধীরে স্বপ্ন পূরণের দিকে তিনি এগিয়ে চলেছেন।

স্কুলের ছাত্রীসংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল সে তথ্য পাওয়া যায় —

বৎসর	ছাত্রী সংখ্যা
ডিসেম্বর ১৯১৫	৮৪
" ১৯১৬	১০৫
" ১৯১৭	১০৭
" ১৯১৮	১১৪
" ১৯১৯	১২৩
" ১৯২০	১২৬
" ১৯২১	১২১
" ১৯২২	১১৪
" ১৯২৩	১২২
" ১৯২৪	১২০
" ১৯২৫	১০৪
" ১৯২৬	১০৯
" ১৯২৭	১২৮
" ১৯২৮	১৪৯ (১২ জন বোর্ডার)
" ১৯২৯	১৩৩
" ১৯৩০	১২৩

(পৃ: ৫৮, পত্রে রোকেয়া পরিচিতি) বর্তমানে এই স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা ১৫০০ জন।

প্রথার মধ্যে অবরোধের ঘেরাটোপে বেড়ে ওঠা রোকেয়ার পড়াশোনার সুযোগ হয় নি। যিনি কোনদিন স্কুলেই যান নি, স্কুলের পরিবেশ যার অপরিচিত, তিনি কিভাবে স্কুল পরিচালনা করেছিলেন তা ভাবলে আজও বিস্ময়ের সীমা থাকে না। তিনি নিজেই

বলেছেন, "প্রথম যখন পাঁচটি মেয়ে নিয়ে স্কুল আরম্ভ করি তখন ভারী আশ্চর্য ঠেকিয়াছিল এই কথা যে, একই শিক্ষয়িত্রী কেমন করিয়া একসঙ্গে একই সময়ে পাঁচটি মেয়েকে পড়াইতে পারেন।" *(পৃ: ৩২, শামসুন নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৬)*

মুসলিম সমাজের পর্দাপ্রথাকে অতিক্রম করে ছাত্রীরা পায়ে হেঁটে স্কুলে আসার মত সমাজ তখনও তৈরি হয় নি। অথচ নারীশিক্ষার প্রয়োজনে সেদিনের স্বল্প শিক্ষিতা, স্ব-শিক্ষিতা একজন নারী গাড়ি করে ছাত্রীদের আনা নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে'র নিজস্ব প্রথম ও দ্বিতীয় গাড়ি ক্রয় করা হয় ১৯১৫ সালে। প্রথম গাড়িটি ক্রয়ের বিষয়ে মরহুম মৌলানা মহম্মদ আলী পঁচিশ টাকা আর্থিক সহায়তা দান করেন। ১৯১৬ সালে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রয়োজন হল তৃতীয় গাড়ির। এই তৃতীয় গাড়ির মোট মূল্যের অর্দ্ধেক বহন করেন মিসেস আব্দুল করিম মেহেরবাণী। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে তা দাঁড়াল ১০৫ জনে। প্রয়োজন এবার আরও একটি গাড়ির। চতুর্থ গাড়িটি ১৯১৮ সালে নভেম্বরে কেনা হল ১১০৮ টাকা দিয়ে যার মধ্যে ৫৫০/-টাকা এলো সরকারী সাহায্য থেকে। ১৯২৫ সালে স্কুলের জন্য পঞ্চম গাড়িটি কেনা হয়। তা সত্ত্বেও ছাত্রী সংখ্যা কিন্তু আশানুরূপ বাড়ে নি। ১৯২৬ সালে প্রথম মোটর বাস ও ১৯২৮ সালে দ্বিতীয় বাস কেনা হয়। ১৯২৫ সালে ১০৪ জন ছাত্রী যেখানে; ১৯৩০ সালে বেড়ে হল ১২৩ জন।

পর্দানসীন মুসলিম জেনানাদের স্কুলে আনার জন্য যে মোটর গাড়ি বা বাসের ব্যবস্থা রোকেয়া করেছিলেন সেই বিষয়েও নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়। তিন ইঞ্চি চওড়া ও দেড় ফুট লম্বা জালের দুটি টুকরো না থাকলে বাসটিকে সম্পূর্ণ 'এয়ার টাইট' বা 'Moving Black Hole' বলা যেত। পর্দাপ্রথার ঘেরাটোপে বন্দী মুসলিম রমণীদের শিক্ষার জগতে আনার জন্য অভিভাবকদের অনুরোধেই তাঁকে এই ব্যবস্থা করতে হয়। এই গাড়িতে চড়ে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই গাড়ির এই ব্যবস্থা পরিবর্তন করে গাড়ির দ্বারের খড়খড়িটা নামিয়ে দিয়ে একটা রঙিন কাপড়ের পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তথাপি ছাত্রীরা স্কুলে এলে দেখা যায় — দুই তিনজন অজ্ঞান হয়েছে, দু-চারজন বমি করেছে, কয়েকজনের মাথা ধরেছে। এরপর খড়খড়ির পরিবর্তে দুই খণ্ড কাপড়ের পর্দা

দেওয়া হয়। তাতে পর্দাপ্রথার রীতি ভাঙ্গা হল বলে মনে করে ও ভীষণ বিপর্যয়ের কথা চিন্তা করে অভিভাবক ও 'কাঠমোল্লা'রা বেগম রোকেয়াকে অপমান ও তাঁর চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যে অপবাদ দিতে থাকে। নীরবে তাঁকে এ অপমান সহ্য করতে হয় প্রাণসম স্কুলটিকে বাঁচাবার জন্য। তাই তিনি আক্ষেপ করে লিখেছেন, "আমার হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরিবর্তে সমাজ বিস্ফারিত নেত্রে আমার খুঁটিনাটি ভুলভ্রান্তির ছিদ্র অন্বেষণ করিতেই বদ্ধপরিকর।" *(পৃ: ৫০৯, পত্র নং ১, রোকেয়া পরিচিতি, ঐ)*

ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি ও গাড়ির ব্যবস্থার পাশাপাশি রোকেয়া এবার দৃষ্টি দিলেন স্কুলের সার্বিক উন্নয়নের দিকে। "১৯১৫ সালে পাঁচটি ক্লাস নিয়ে স্কুলটি উচ্চ প্রাইমারী পর্যায়ে পৌঁছায় ও ১৯১৭ সালে মধ্য ইংরেজী স্কুলে পরিণত হয়। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত এইভাবেই চলে। ১৯২৭ সালের শুরুতে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার আগ্রহেও মিসেস হোসেনের ঐকান্তিক চেষ্টায় ৭টি মেয়ে নিয়ে ফোর্থ ক্লাস খোলা হয়।" *(পৃ: ৫৮-৫৯, মোশফেকা মাহমুদ, পত্রে রোকেয়া পরিচিতি, ঐ)* ১৯২৭ সালে কিন্ডারগার্ডেন বিভাগের উদ্বোধন করা হয়। ১৯৩০ সালে বেগম রোকেয়ার অসাধারণ অধ্যবসায় ও আন্তরিক অনুপ্রেরণার ফলস্বরূপ 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বাংলাভাষী মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ তখনো শক্তিমান শ্রেণী হিসেবে গড়ে ওঠে নি। বেগম রোকেয়ার পিতৃ পরিবারে এবং স্বামী 'সাখাওয়াত হোসেনের গৃহেও উর্দু ভাষাই চলিত ছিল। সমাজে শিক্ষার বিস্তার ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালী মুসলমানের আত্ম-অন্বেষা ও তার জাতিগত বাংলাভাষিক পরিচয় যে ক্রমশ গুরুত্ব অর্জন করতে শুরু করে তা বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশকে বাংলা ও উর্দু ভাষার বিতর্কেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯১৭ সালের প্রথমদিকে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রী নিয়ে স্কুলে বাংলা বিভাগ চালু করা হয়। বাংলা বিভাগে দিন দিন ছাত্রী সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণে বাংলা বিভাগে শিক্ষিকার বেতনের খরচ যোগান অযৌক্তিক মনে করে ১৯১৯ সালে স্কুল থেকে বাংলা বিভাগটি উঠে যায়। অথচ এর পরপরই ধীরে ধীরে বাঙালী মুসলমান সমাজের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুলে' বাংলা বিভাগ খোলার জন্য অনুরোধ আসতে থাকে। তিরিশের দশকে এই স্কুলে আবার বাংলা বিভাগ খোলা হয় এবং ছাত্রী সংখ্যাও ছিল আশানুরূপ। এই ছাত্রীদের পরীক্ষার রেজাল্টও ছিল

যথেষ্ট ভাল। স্কুলের ২১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বেগম রোকেয়ার যে বক্তব্য তা প্রকাশিত হয় 'দি মুসলমান' পত্রিকায়। তাতে তিনি আনন্দের সঙ্গে বলেন, " There are grumbling in some quarters that this school did not teach Bengali properly, but that complaint is a thing of the past. The girls, who are reading Bengali instead of Urdu, are getting on very nicely. Since 3 years they are showing excellent results in the Bangiya Balika Shiksha Parishad Examination, where these poor 'Seclusion fettered' girls have to complete with about 700 Bengali non-purdah girls. The Bengali papers were corrected by the professors of Bangladeshi college with strict justice, yet our girls passed in the 1st division, it is not a matter to be proud of ?" *(P 2. The Mussalman Vol. VIII, March 17, 1932, No. 31; তথ্যঋণ : পৃ. ৯৯, তাহমিনা আলম, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, চিন্তা চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২)* ১৯১৭ সালে ১৫ই মার্চ স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীর ব্যবস্থা করেন রোকেয়া। তৎকালীন স্কুলপরিদর্শিকা ছিলেন মিস এস. বোস। তিনি স্কুলটি পরিদর্শনের পর তাঁর প্রশংসাসূচক ভাষণে বলেন — "(Sakhawat Memorial Girls School) was started in a very small house at Waliullaah Lane with only 8 girls' on the roll. When I first visited it, it could hardly he called a school, but now I am glad to notice the gradual development and rapid progress it had made in the course of only six years." *(P 10, The Mussalman, Vol. XXIII, April 26, 1929, No. 16; তথ্যঋণ : পৃ: ৯৪, তাহমিনা আলম, ঐ)* এইভাবে নারীশিক্ষার যে ইতিহাস রচিত হতে লাগল সেখানে এসে দেখা গেল প্রত্যেক বছর একটি একটি ক্লাস বাড়তে বাড়তে ১৯৩১ সালে এসে তিনটি মেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসে। এম. এ. ফতেমা খানমের (১৮৯৪-১৯৭৭) আবুল ফজলকে লেখা একটি পত্র যা 'সমকাল', অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তার থেকে জানা যায়, "তাঁর স্কুলে তফসির সহ কোরান পাঠ থেকে আরম্ভ

করে ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, পার্শী, হোম নার্সিং, ফাস্ট এড, রন্ধন, সেলাই ইত্যাদি মেয়েদের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সমস্তই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।" *(তথ্যঋণ : পৃ: ২৪, আবদুল মান্নান সৈয়দ, বেগম রোকেয়া, অবসর প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৬ দ্বিতীয় মুদ্রণ)* সূচীশিল্পে এই স্কুলের মেয়েরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে 'পদক' লাভ করে। ১৯২৪ ও ১৯২৮ সালে কলকাতায় যে প্রদর্শনী হয় সেখানে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে'র ছাত্রীরাই শুধু দর্শনীয় জিনিস পাঠায়। শুধু বিদ্যাচর্চা ও শিল্পকলাতেই নয় সমাজসেবায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতেও শেখায় এই স্কুল। তাই 'মহাযুদ্ধ সাহায্য তহবিল', 'পূর্ব-বাংলা-বাত্যা দুর্গত সাহায্য তহবিল' ইত্যাদি সেবামূলক কাজে ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। ১৯৩১ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গীয় শিক্ষা পরিষদে'র সেন্ট্রাল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে কৃতকার্য হওয়ার তালিকায় এই স্কুলের ছাত্রীদের নাম কম দীর্ঘ নয়। এঁরা হলেন — নূরজাহান, সামসুন্নেশা, সালেহা খাতুন, মাহমুদা খাতুন, ফজিলা খাতুন, মোমেনা খাতুন, কাইসারি বেগম ইত্যাদি।

বেগম রোকেয়ার কন্যাসম স্কুল তাকে রক্ষা করার জন্য নানা প্রতিবন্ধকতাকে দু'হাতে সরিয়ে তিনি স্কুলটিকে বাঁচিয়ে রাখেন। স্কুলে কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে লাগল। অত্যন্ত অনিয়মিত সরকারী অনুদানের একটি হিসেব পাওয়া যায়, সেটি এইরকম —

সাল	যে খাতে অর্থ পাওয়া যায়	আর্থিক অনুদান
১৯১৩	ঘোড়ার গাড়ির অর্ধেক মূল্য	৭৫০্ টাকা
১৯১৪	লেডী কারমাইকেলের বিশেষ সাহায্য	৩০০্ ”
১৯২২	ফার্স্ট এডের সরঞ্জাম বাবদ	৫০্ ”
১৯২৩	আসবাবপত্র বাবদ	১৫০্ ”
১৯২৪	আসবাবপত্র বাবদ	১০০্ ”
১৯২৫	পুস্তক ক্রয় বাবদ	৭০০্ ”
১৯২৬	যানবাহন বাবদ	৫০০০্ ”
১৯২৮	আসবাবপত্র, পুস্তক, গাড়ী বাবদ	৫৯৭৫্ ”
১৯৩০	লেডী জ্যাকসনের সাহায্য	২৫০্ ”

১৯২৮ সাল থেকে নিয়মিত ৭৫০/- টাকা সরকারী অনুদান পাওয়া যায়।

শিক্ষার অনুদানের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক রাজস্বখাতে দেখা যায় যে, কলকাতাতেই অমুসলিম বালিকা বিদ্যালয়গুলি যে হারে সরকারী সাহায্য পেয়েছে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল তা পায় নি। সরকারী অনিয়মিত অর্থ সাহায্য স্কুলের আর্থিক সংকটের অন্যতম কারণ যা পূরণের জন্য নিজস্ব সম্পত্তি সহ জমানো টাকাও বেগম রোকেয়াকে দান করতে হয় এবং প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থাতেও তিনি স্কুলটির শিক্ষার গতিকে অম্লান রেখেছিলেন। সরকারী অর্থ ব্যয়ের চিত্র (১৯২৮-২৯) সালের একটি হিসাবে দেখা যায় —

উচ্চবিদ্যালয়ে শুধু মুসলিম ছাত্রীদেব জন্য	৯,৬৫০/-
উচ্চবিদ্যালয়ে শুধু অমুসলিম ছাত্রীদের জন্য	৪,৭৬,৫৯৪/-
মধ্য বিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রীদের জন্য	৩৮৬০/-
মধ্য বিদ্যালয়ে অমুসলিম ছাত্রীদের জন্য	১,৪৬,৬৭২/-

(পৃ: ৬১, পত্রে রোকেয়া পরিচিতি, মুশফেকা মাহমুদ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৬)

রংপুরবাসী কয়েকজন দানশীল ব্যক্তি দান করেন স্কুল নির্মাণ তহবিলে। লেডি জাকসনের নিকট আবেদন জানালে তিনিও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করেন। আর্থিক অনটন ও অস্বচ্ছলতার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে 'The Mussalman' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে সরকারী আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। "We are, therefore, appealing to the generous public to help us with funds for the purpose ... subscription however small, will be greatfully accepted. Money may be sent to only of the undersigned.

1. Mrs. R. S. Hossein - Superintendent and Foundress.
Sakhawat Memorial Girls' School, 86/A, Lower Circular Road, Calcutta.
2. Mowdud Rahman ESQ, B. A., Bar-at-law, Judge, Court of small causes, Calcutta — Hony. Secretary, School Committee, 44, Baniapukhar Road, Calcutta.
3. Dr. S. A. Ahmed, L. M. S., M. D. (C.H.C.) M. R. A. S (Land) Hony. Magistrate, Sealdah, — Organiser, Sakhawat Memorial Girls' School, 20, Tanti Bagan Road, Calcutta." *(The Mussalman, Vol. XIX, T. W.*

Edition, Vol. I, Novenber 14, 1925, No. 124, P. 5; তথ্যঋণ : পৃ: ১০২, তহমিনা আলম, ঐ)

১৯২৭ সালে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়' ও 'সোহরাওয়ার্দী বালিকা বিদ্যালয়ে'র একত্রীকরণ ও সরকারী সাহায্যের জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। পরে নানা বিরোধিতার কারণে বিষয়টি বাতিল হয়ে যায়। প্রারম্ভিক পর্বে ছাত্রীদের শিক্ষাদান থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজ রোকেয়া একাই করতেন। তাঁর জন্য যে মাসোহারা নির্দিষ্ট ছিল তা তিনি গ্রহণ করতেন না। পরবর্তীকালে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব তিনি অনুভব করেন। কিন্তু অর্থের অপ্রতুলতার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের অসুবিধা ছিল। "বেগম রোকেয়া ঢাকা থেকে শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহের চেষ্টা করেন। ঢাকার পোস্তা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ফতেমা খানম রোকেয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে শাখাওয়াত গার্লস স্কুলে যোগদান করেন। স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা সবাই ছিলেন দেশীয় খৃষ্টান, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, হিন্দু এবং বাঙালি মুসলমান। প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন মিস্ সিনহা নামে একজন খৃষ্টান মহিলা।" *(পৃ: ৮৬, আনোয়ার হোসেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী (১৮৭৩-১৯৪৭), প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা ২০০৬।)*

উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবে স্কুলকে দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। স্কুলের প্রতি বছরের বার্ষিক রিপোর্টে মুসলিম মহিলা শিক্ষয়িত্রীদের উপযুক্ত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থার জন্য আবেদন করা হচ্ছিল। তারই ফলে ১৯১৯ সালের শেষভাগে একটি মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল। স্কুলের জন্য ট্রেনিং স্কুল থেকে ট্রেইন্ড শিক্ষয়িত্রী পেতে কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয় এবং সাখোয়াত স্কুলের পক্ষে গৌরবের বিষয় যে, পরবর্তীকালে মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষয়িত্রীই ঐ স্কুলেরই পুরনো ছাত্রী ছিলেন। এবং এইভাবে শিক্ষাকে তিনি ব্যাপকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে যে পেরেছিলেন এই ঘটনাগুলি তার নিদর্শন। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু। ১৯১৭ সালের 'The Mussalman' পত্রিকায় আর রহমান নামে এক ব্যক্তি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে, বাংলার প্রধান শহর কলকাতায়, কোন বাংলা মাধ্যম স্কুল নেই মুসলমান মেয়েদের জন্য। রোকেয়া স্থাপিত স্কুলটি সে অভাব পূরণ করতে পারে নি। তবে সেই সময় বাংলা বিষয়ের একটি ক্লাস ছিল। তাঁর একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও বাংলা বিভাগ

চালু করার অন্তরায়গুলি তখনও বর্তমান ছিল। ১) বাংলা পাঠ্য পুস্তকের অভাব ২) বাংলা শিক্ষয়িত্রীর অভাব ৩) ছাত্রীর অভাব — সবকটি কারণই এই বিভাগ খোলার পক্ষে প্রতিকূল ছিল। ১৯১৭ সালের 'দি মুসলমান' পত্রিকায় বেগম রোকেয়া তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন। কলকাতা শহরে যেসব মুসলমান পরিবারে তিনি যেতেন, সেসব পরিবারের মেয়েরা, যাঁরা উর্দু বলতেন খুব খারাপ, তাঁরাও বাংলায় কথা বলতে রাজি ছিলেন না, বলতেন বাংলা তাঁরা ভুলে গিয়েছেন। ১৯১১ সালে যখন স্কুল শুরু হয় তখন বেগম রোকেয়া ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বলে বোঝাতেন। " কিন্তু ছাত্রীদের অভিভাবকরা বলতে লাগলেন, ইংরেজি যেন বোঝানো হয় উর্দু ভাষার মাধ্যমে। অথচ কলকাতা শহরে উর্দু ভাষায় পড়ানোর যোগ্য শিক্ষিকা পাওয়া মুশকিল ছিল। এই বিশেষ কারণের জন্যই তিনি উর্দু মাধ্যম দিয়ে স্কুল চালানো শুরু করেন।" *(পৃঃ ৬৫, সুতপা ভট্টাচার্য, রোকেয়া, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৬)*

এই সময় কলকাতার নারীশিক্ষার যে চিত্রটি পাওয়া যায় তা হল এইরকম — ১) বেথুন কলেজিয়েট স্কুল ২) ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল ৩) ক্রাইস্ট চার্চ স্কুল সহ ৭টি উচ্চবিদ্যালয়, ৪) ৬টি এম. ই. স্কুল, ৫) ৫টি ভার্নাকুলার স্কুল, ৬) ৪১টি উচ্চ প্রাথমিক, ৭) ৪১টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। আর মুসলমান মেয়েদের জন্যে নিম্ন মাধ্যমিক উর্দু স্কুল ছিল ১৪টি এবং ২৫টি কোরান স্কুল বা মক্তব। অর্থাৎ বাংলা ভাষী মুসলমান মেয়েদের স্কুলের অভাব থেকেই যায়। অসহযোগ আন্দোলন এবং আইন অমান্য আন্দোলনের সময়পর্বে (১৯২২-১৯৩২) অনেক বিরোধিতা সত্ত্বেও বৃটিশ সরকার নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তা দান করে। নারীশিক্ষার ধারা প্রবাহিত ছিল ১৯২৭ সালে হিন্দু-মুসলমান শিক্ষিত মহিলার (স্কুলশিক্ষা) যে খতিয়ান পাওয়া যায় তা শতকরা হিসাবে নিম্নরূপ —

ডিভিসন	হিন্দু মহিলা	মুসলিম মহিলা
ঢাকা	২৯.০৫	১.০৫
প্রেসিডেন্সি	৩৫.০৫	৩.০২
বর্ধমান	১১.০৬	৭.০২
চট্টগ্রাম	২০.০১	২.০২
রাজশাহী	৯.০৪	১.০৭

(মোহম্মদ আকরম খাঁ, 'ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার' মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, সংখ্যা ২, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪; তথ্য ঋণ : পৃ: ৯৭, আনোয়ার হোসেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী (১৮৭৩-১৯৪৭), প্রগতিশীল প্রকাশক, প্রথম সংস্করণ ২০০৬)

শুধু ছাত্রী নয়, শিক্ষয়িত্রীদের সম্পর্কে তিনি চিন্তা করেছেন নারীশিক্ষার দীপকে অনির্বাণ রাখার জন্য তাঁর অনলস প্রয়াস লক্ষ করা যায় এই উক্তিতে — "বাহিরে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করিয়াছি, ভিতরে যে শুধু ছাত্রীদিগকেই উপযুক্ত শিক্ষাদান করিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহা নয় — সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীদিগকেও ক্রমাগত নিজের হাতে গড়িয়া লইতে হইয়াছে। স্কুলের জন্য 'জগত ছানিয়া কি দিব আনিয়া' — এভাবে প্রাণপণ যত্ন করিয়া মাদ্রাজ, আরা, গয়া, আগ্রা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে শিক্ষয়িত্রী আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।" *(পৃ: ৩৫, শামসুর নাহার, রোকেয়া জীবনী)*

প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করেও রোকেয়া স্কুলের অস্তিত্ব রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কলকাতা শহরের সেকালের গণ্যমান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে যে সাহায্য আশা করেছিলেন, তাঁরা সাহায্য না করে স্কুলের বিরুদ্ধে কূট ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করতেও পিছপা হননি। "কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজপতিরাই শুধু একা নন ধর্মান্ধ মোল্লা মৌলবীরাও বেগম রোকেয়ার শিক্ষাবিস্তার কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টাকে ধিক্কার দিয়েছিলেন।" *(পৃ: ৪৮, মোতাহার হোসেন সুফী, বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০০৯)*

স্কুলকে ঘিরে তাঁর অনলস প্রয়াসের ফলে তৎকালীন বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায় তাঁর পক্ষে-বিপক্ষে মতবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। রাজশাহী থেকে প্রকাশিত 'পল্লীবান্ধব' পত্রিকায় বলা হয়েছিল — "স্কুল কমিটি বহুবার সমাজের খেদমতে আর্জি পেশ করিয়াছেন অথচ সমাজ নীরব। নেতাগণ চুপ। যাহারা কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য শতকরা ৫৫ এর ধুয়া ধরিয়া দুনিয়াব্যাপী কসরত করিয়া বেড়ান তাহারা এমন একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু করিতে পারেন কিনা, তাহার বিচারের সময় আসিয়াছে। মুসলমানেরা বেশিরভাগ গরিব একথা স্বীকার করি কিন্তু তিন কোটি মুসলমানই ভিক্ষুক ইহা অসত্য। সমাজনেতাগণ একটু চোখ খুলুন।" *(পল্লীবান্ধব : সম্পাদক এস. এম. ইয়াকুম, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২; পৃ: ৫১, মোতাহার হোসেন সুফী, বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০০৯*

দ্বিতীয় মুদ্রণ) ১৯১৬ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর হায়দ্রাবাদ থেকে সরোজিনী নাইডু বেগম রোকেয়াকে তাঁর কার্যধারার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লেখেন — "মুসলমান নারীদের কল্যাণের জন্য আপনি যে অক্লান্ত সাধনা করিতেছেন, বিধাতা করুন, তাহা জয়যুক্ত হোক। আহা! দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে আপনার স্কুলের মত এই শ্রেণীর স্কুলের আমাদের কী দারুণ প্রয়োজন। এই সকল স্কুল চালনায় শুধু কি সরকারী সাহায্যই দরকার? দেশের উন্নতির জন্য যেসব শিক্ষিতা সহৃদয়া নারীর প্রাণ কাঁদে, তাঁহাদের যত্ন এবং সাধনার প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশী। যখনই আমার কোন ভগ্নী, কি হিন্দু কি মুসলমান, এরূপ দেশ সেবার কাজে অগ্রসর হন; তখনই গৌরবে আমার বুক ভরিয়া ওঠে।" *(পৃঃ ১৫, মোশ্‌ফেকা আহমেদ, পত্রে রোকেয়া পরিচিতি, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৬)* ১৯৩৫ সালের ১৯শে ডিসেম্বর G. O. No. 4404 Edn(S) অনুসারে বৃটিশ সরকার স্কুলটি অধিগ্রহণ করে এবং স্বাধীনতার পর সরকারী বিদ্যালয় রূপে স্বীকৃতি পায়। এই স্কুলে বাংলা ও উর্দ্দু দুটি ভাষাতেই শিক্ষাক্রমের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি শ্রেণীতে ৪০ জন ছাত্রী নিয়ে ৩টি করে বিভাগ আছে। কলা ও বিজ্ঞান শাখা উচ্চমাধ্যমিকে পড়ানো হয়। স্কুলে বিভিন্ন উৎসবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠাত্রী বেগম রোকেয়ার জন্মদিন (মৃত্যুদিনও) ৯ই ডিসেম্বর নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয়। এই স্কুলে শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন। এক কথায় এ যেন ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ১৯৪০ এর দশক থেকে এই স্কুলের শিক্ষিকাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকেই এর সমর্থন পাওয়া যাবে। তালিকাটি এইরকম —

১) মিসেস অমিয়া চক্রবর্তী (খৃষ্টান)
২) মিসেস প্রতিলতা সেন (হিন্দু)
৩) সুবর্ণা বোস (ব্রাহ্ম)
৪) শীলা বোস (খৃষ্টান)
৫) মিসেস মোমেনা খাতুন (মুসলিম)
৬) মিসেস ইউসুফ সাফজোয়ারী (উর্দ্দু শিক্ষিকা)
৭) মিসেস আনোয়ার বাহার চৌধুরী (মুসলিম) ইত্যাদি।

('সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুলে'র প্রাক্তন শিক্ষিকা শ্রীমতী লীলা মজুমদারের

সৌজন্যে প্রাপ্ত)

শিক্ষাব্রতী রোকেয়ার স্কুল স্থাপনা ও তার সিদ্ধির মূলকথাই ছিল — 'টাকা উপার্জন করাই যে শিক্ষালাভের মূল উদ্দেশ্য ইহা আমি কোনকালেই স্বীকার করি নাই। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য : মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা।" *(পৃ: ৩৬-৩৭, শামসুর নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, প্রথম সাহিত্য প্রকাশ সংস্করণ, ১৯৯৬)* রোকেয়ার শ্রম ও আন্তরিকতায় গড়ে ওঠা বিদ্যালয়টির প্রার্থনা সঙ্গীতেও সেই আশার বাণীই ধ্বনিত হয়। স্কুলের প্রার্থনা অনুষ্ঠানে প্রতিদিন মহাকবি ইকবালের লেখা 'ইয়া রাব দিলে মুসলিম কো জিন্না তামান্না দো" — অর্থাৎ হে প্রভু, মুসলমানের হৃদয়ে ফলবান আশার সঞ্চার করুন — রোকেয়ার সময় থেকেই এটি পিয়ানো বাজিয়ে গাওয়া হোত।

কঠোর নিয়মের মধ্যে বেড়ে ওঠা রোকেয়ার মন শিশুকাল থেকে অবরোধপ্রথার বেড়া ভেঙ্গে ফেলার জন্য একটু একটু করে প্রস্তুত হচ্ছিল। গৃহের অভ্যন্তরে সাহিত্যব্রতী এই নারী নারীর মুক্তির যে স্বপ্নাদর্শের কথা তাঁর সাহিত্য সৃজনে বলে আসছিলেন, তাই বাস্তবায়নের পথ খুঁজে পেল এই স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে। আজ শতবর্ষ অতিক্রান্ত — এই স্কুলের যাত্রার ইতিহাস। একজন গৃহবন্দী নারীর কি গভীর নিষ্ঠা, একাগ্রতা, জেদ, সাহস ছিল — যা দিয়ে তিনি 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল' স্থাপন করেন। জ্ঞানের আলো, মুক্তবুদ্ধি, চিন্তার ঔদার্য ও যুক্তিবাদ যা রোকেয়ার অন্তরের সৌন্দর্য্য ছিল। স্কুল স্থাপনায় একটি রোকেয়া থেকে সহস্র সহস্র রোকেয়ায় তা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তিনি শিক্ষায় নারীর অধিকারের কথা বলে নারীকে নিয়ে এসেছেন প্রগতির ময়দানে, 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' সেই প্রগতির ময়দান। সেখান থেকে শহরবাসী মুসলিম নারীর বিদ্যাচর্চা শুরু। এপার বাংলা, ওপার বাংলায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন এই স্কুলের কৃতি ছাত্রীবৃন্দ। এঁরাই ১৯৯৭ সালের ১০ই মে কলকাতার 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয় প্রাক্তনী সংসদ', কলকাতা ও ২০০১ সালে মার্চ মাসে ঢাকা, বাংলাদেশে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল এ্যালোমনাই এসোসিয়েশন' স্থাপন করেন যা দুটি দেশের মৈত্রী বন্ধনকে অটুট রাখে। এ তো রোকেয়ারই দান।

বেগম রোকেয়ার জীবৎকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রধানা শিক্ষিকাদের নামের একটি তালিকা পাওয়া যায় —

১)	এম এস সাকিনা সুলতানা মোয়াজেদা	১৯২৭ - ১৯৩৬ সাল
২)	" " ভারতী চক্রবর্তী	১৯৩৬ - ১৯৩৮ সাল
৩)	" " আসিয়া হাসান (মজিদ)	১৯৩৮ - ১৯৪৪ "
৪)	" " মাধুরী মুমগেন (Officiating)	১৯৪৪
৫)	" " আনোয়ারা বাহার চৌধুরী	১৯৪৪ - ১৯৪৭ "
৬)	" " সুহাসিনী বিশ্বাস	১৯৪৭ - ?
৭)	" " শান্তি ব্যানার্জী	১৯৫১ - ১৯৬৭ "
৮)	" " হেমপ্রভা	১৯৬৭ - ১৯৭৪ "
৯)	" " শোভনা দাসগুপ্ত	১৯৭৪ - ১৯৭৮ "
১০)	" " অনিমা বসু (Officiating)	১৯৭৮ - ১৯৭৯ "
১১)	" " বীণা বাসু	১৯৭৯ - ১৯৮৩ "
১২)	" " মলিনা গুহ	১৯৮৩ - ১৯৯৩ "
১৩)	" " শিপ্রা দাসগুপ্ত	১৯৯৩ - ১৯৯৫ "
১৪)	" " লীনা সেনগুপ্ত (Officiating)	১৯৯৫ - ১৯৯৮ "
১৫)	" " (প্রধানা শিক্ষিকা)	১৯৯৮ - ২০০৪ "
১৬)	" " শুক্লা রায়	২০০৪ - ২০০৭ "
১৭)	" " পাপিয়া নাগ (সিংহ মহাপাত্র)	২০০৭ - বর্তমান সময়

'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুলে'র বর্তমান প্রধানা শিক্ষিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সুতরাং দেখা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকাল থেকে স্ত্রীশিক্ষা একটি আন্দোলনে পরিণত হয়। সমাজে মেয়েদের স্থান, তাদের কর্তব্য, তাদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে নূতন করে চিন্তা-চেতনার জগৎ খুলে গেল। মেয়েদের কণ্ঠস্বর আর অশ্রুত রইল না, মেয়েদের নিজস্ব জগৎ নির্মিত হতে লাগল। এই ভাঙ্গাগড়ার ক্রান্তিকালে কখনও প্রতিকূলতার উজান বেয়ে, কখনওবা সহৃদয় পুরুষের সাহচর্য ও উদারতায় সমাজ পরিবর্তনের যে চিত্রপট রচিত হল তাকে মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায় 'রঙ্গশালা' বলা চলে। মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার বিদ্রোহী পদক্ষেপটি প্রথম গ্রহণ করেন শিক্ষাব্রতী বেগম রোকেয়া সাখোয়াৎ হোসেন।

রোকেয়াকে সমাজ চেনে তাঁর স্কুল স্থাপনার মত মহৎ কর্মে। আর সেই কর্মকাণ্ডই এমন একটি সৌধ রচনা করে যার নাম 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' (১৯১৬)। শুধু প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাতেই নয়, দেশ-কাল-সময়-সমাজকে জানাও নারী সচেতনতার পূর্ণতর বিকাশ। বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্বেই সচেতন, শিক্ষিত হিন্দু-ব্রাহ্ম নারীরা গঠন করেছেন বেশ কয়েকটি সমিতি — আর্যসমিতি (১৮৮২), সখী সমিতি (১৮৮৬), মহিলা শিক্ষা সমিতি (১৯০৭), ভারত-শ্রী-মহামন্ডল (১৯১৩), নারীশিক্ষা সমিতি (১৯১৯) ইত্যাদি। এইসব নারীকল্যাণমূলক সমিতিগুলি নারীর নিজস্ব একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। বেগম রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটি তাতে নূতন পালক সংযোজন করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপর্ব থেকে শিক্ষিত সংস্কৃতিপরায়ণ নারী সমাজকল্যাণমূলক কাজে শুধু নিযুক্তই হন নি, তাঁদের সংগঠনী প্রতিভা, কর্মক্ষমতা ও পরিচালন ক্ষমতার পরিচয় রেখে যান। এই একই সময়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়েই মুসলিম নারীর মুক্তির জন্য ও সভা সমিতি কন্‌ফারেন্স ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। ১৯০৫ সালে আলিগড়ে গড়ে উঠেছিল আত্তীয়া বেগমের 'মুসলিম লেডিজ কনফারেন্স'। ১৯০৭ সালে বেগম মোহাম্মদে শাফি লাহোরে প্রতিষ্ঠা করেন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম'। "১৯১৯ সালে আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ডেকান এবং 'লক্ষ্মৌ উইমেন্স অর্গানাইজেশন' প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলিম মহিলা কর্মী বেগম হবিবুল্লাহ, বেগম ওয়াসিম, বেগম আইজাজ রসুল এবং লেডি ওয়াজির হোসেন এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁরা পর্দার বিরুদ্ধে মুসলিম মহিলাদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন।" *(পৃ: ৫০-৫১, Shahnawar Begum, Father and Daughter, Lahore, Nigarishet, 1971.)* অর্থাৎ পর্দাপ্রথার অবরোধ থেকে মুসলিম নারী সংগ্রামের পথে হাঁটতে শুরু করেছে। আর এই ধারার সংযোজন কলকাতার আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম। "এই সংস্থাটি গঠনের অনেক আগে ১৯১৩ সালে কলকাতার ৪নং মেডিকেল কলেজ স্ট্রিটে বাঙালী মুসলমান মহিলাদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'তুর্কি রিলিফ ফান্ড'-এর জন্য অর্থ সংগ্রহ। তুরস্কের আহত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে সমবেদনা জানিয়ে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এক হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য রাখেন।" *(পৃ: ১৬২, আনোয়ার হোসেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী' (১৮৭৩-১৯৪৭) প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০০৬, প্রথম প্রকাশ)*

১৯১৩ সালে ভূপালের নবাব বেগম সুলতান জাহানের নেতৃত্বে ভূপালে একটি সর্বভারতীয় মুসলিম মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে বাল্যবিবাহ, নারীশিক্ষা, অবরোধপ্রথা, নারীর উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনার জন্য সমাজ সংস্কার আন্দোলনের উদ্যোগ নেওয়া ও কর্মসূচি তৈরি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এটি বিস্ময়কর যে মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন নারী বেগম রোকেয়া প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে মুসলিম নারীদের সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং আত্মবিকাশের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন মুসলিম নারীদের সমিতি। ব্রাহ্ম ও হিন্দু সমাজে যেমন নারীশিক্ষা ও নারীকল্যাণমূলক সমিতি স্থাপন নারীদের দ্বারা পরিচালিত হলেও যবনিকার অন্তরালে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সহায়তা ছিল, কিন্তু রোকেয়া বেগমকে একাই পথ চলতে হয়েছিল।এই কথাটা বার বার আমাদের স্মরণ করতে হয় এই মহীয়সী নারীর কথা বলতে গেলে। ১৯১৩ সালের ঘটনা মুসলিম নারীর চিন্তা-চেতনার জাগরণকেই চিহ্নিত করে। সেই নারী জাগরণের কালে নারী কল্যাণের বহুমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাতেই নয়, দেশ-কাল-সময়-সমাজকে জানাও নারী সচেতনতার পূর্ণতর বিকাশ। এটি বিস্ময়কর যে মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন নারী প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে মুসলিম নারীদের সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই এই 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তিচেতনা ও সমাজচেতনার সমন্বয় সাধনে একটি মানুষ পূর্ণতা পায়। রোকেয়া নারীকে সেই পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি করলেন সমিতি। নারী সমাজকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে একটি ভিন্ন মঞ্চ দরকার একথা রোকেয়ার উপলব্ধিতে ছিল বলে আঞ্জুমানে খাওয়াতীনের প্রতিষ্ঠা। "গভীর অন্ধকারে রোকেয়া শিক্ষার মঙ্গলদীপ জ্বালিলেন; সমাজের ভবিষ্যৎ জননীদিগকে নিজের হাতে গড়িয়া তুলিবার ভার নিলেন; সেই সঙ্গে মুসলিম নারীদের সামাজিক জীবন গঠন করিয়া তুলিবারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন।' *(পৃ: ৫০, শামসুল নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, ঐ)* "এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নবাব বেগম সলিমুল্লাহ, লেডী শামসুল হুদা, লেডী আব্দুর রহীম, লেডী গজনভী, নবাব বেগম বদরুদ্দীন হায়দার, মিসেস এ. কে. ফজলুল হক, মিসেস আব্দুল করিম। পরবর্তী সময়ে মিসেস এম. এ. মোমিন, নবাব বেগম

ফারুকী, মিসেস আজিজুল হক, মিসেস এ. রেজাউর রহমান খান, মিসেস আর. আহমেদ, মিসেস নুরুন্নবী চৌধুরী, মিসেস রেশাদ, বেগম আসিয়া খাতুন, এম. ফতেমা খানম, মিসেস রশীদ, মিসেস সুফিয়া, এন. হোসেন, মিসেস গাফফার, মিসেস শামসুল নাহার মাহমুদ — সমিতির সদস্য হিসেবে সমিতির কার্যক্রমে নিয়োজিত ছিলেন।" *(পৃ: ৪, আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে, নিয়মাবলী ১৯৩৪; তথ্যঋণ : পৃ: ১১৭, তাহামিনা আলম, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২, প্রথম প্রকাশ)* এছাড়া পরবর্তীকালে আনোয়ার বাহার চৌধুরী, সৈয়দা কানিজ সুখরা সারজাওয়ারী — এঁরাও যুক্ত ছিলেন।

১৯১৭ সালের ১৫ই এপ্রিল মিসেস আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে ৮৬/এ লোয়ার সাকুর্লার রোডের অফিসে আঞ্জুমানে খাওয়াতীনের প্রথম বার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ জন মুসলিম নারী। ১৯১৮ সালে ৭ই জুন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলামে'র দ্বিতীয় বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়, সভাপতিত্ব করেন লেডী শামসুল হুদা। এই সভায় ৬০ জন মহিলা জমায়েত হন। এই সভাতেই আগামী দুটি বছরের জন্য পরিচালন সমিতির কর্মকর্তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। তালিকাটি নিম্নরূপ —

প্রেসিডেন্ট	লেডী শামসুল হুদা
ভাইস প্রেসিডেন্ট	নবাব বেগম বদরুদ্দীন হায়দার
,,	মিসেস মাহবুব আলী
,,	মিসেস আব্দুর রহিম বক্স এলাহি
,,	মিসেস নাজিরি আরিফ
অবৈতনিক সেক্রেটারী	মিসেস খান বাহাদুর সাখোওয়াত হোসেন
অবৈতনিক সহকারী সেক্রেটারী	মিসেস খান বাহাদুর দাউদুর
অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ	আবেদ এ মোকাররম।

(পৃ: ৭১, The Mussalman, Vol. XI, April 20, 1917; No. 21; তথ্যঋণ : পৃ: ১১৯, তাহমিনা আলম, ঐ) ১৯৩২ সাল পর্যন্ত 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুলে'ই আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে সভা অনুষ্ঠিত হত।

'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম'-এর লক্ষ্যই ছিল বিবাহ, তালাক, শিশুপালনসহ

বহির্বিশ্বের সম্পর্কে নারীজাতিকে সচেতন করে তোলা। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষা ও জাগরণের আলো ছড়িয়ে দেওয়া। ধর্ম্মের পথে বঞ্চনা আছে, প্রাপ্তিও আছে — কিন্তু নারী তা জানে না। তাই সভা করে তা জানাতে হয়। "ধর্ম তাদের অনেক সুবিধা দিয়েছে কিন্তু অজ্ঞতা ও সংস্কারের বেড়ীতে তারা এমনি আবদ্ধ যে তারা তা জানেও না। প্রতি মাসে সমিতির সভা ডেকে, মহিলাদের একত্র করে প্রচার করা হতো এই জাগরণের বাণী।" *(পৃ: ৩০, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, শামসুল নাহার মাহমুদ, ১৯০৮-১৯৬৪, ঢাকা, ১৯৮৭)*

এই নারী সমিতির উদ্দেশ্য ছিল — "সম্বলহীনা বিধবা নারীকে সাহায্য দান, লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত নারীর রক্ষা, সমাজ পরিত্যক্ত ও দুঃস্থ মেয়েদের এবং অনাথ শিশুদের সাহায্য দান এবং একইসঙ্গে নারীর অধিকার সচেতনতা, রাজনৈতিক চেতনা, বিশ্ববোধ জাগিয়ে তোলা।" *(পৃ: ২৪২, গীতশ্রীবন্দনা সেনগুপ্ত, স্পন্দিত অন্তর্লোক, আত্মচরিতে নারী প্রগতির ধারা, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯, প্রথম প্রকাশ)* এই বিষয়ে আরো বিশদভাবে জানা যায় রোকেয়া-জীবনীকার শামসুল নাহার মাহমুদের রচিত রোকেয়া-জীবনী, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬ গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায় — "আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে তাহার এই দীর্ঘকালের জীবনে কি কি কাজ করিয়াছে, তাহার বিবরণ আলোচনা করিলে দেখা যায়, অতীতে বহু বিধবা নারী ইহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়াছে, বহু বয়ঃপ্রাপ্তা দরিদ্রা কুমারী ইহার সাহায্যে সৎপাত্রস্থা হইয়াছে, বহু অভাবগ্রস্তা বালিকা ইহার অর্থে শিক্ষালাভ করিয়াছে। ... কলিকাতার মুসলমান নারীসমাজের গত বিশ বৎসরের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় এই সমিতি দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর আড়ালে মুসলমান সমাজকে কতখানি ঋণী করিয়া রাখিয়াছে।"

'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামে'র নিয়মাবলীতে দেখা যায় যে এর সাংগঠনিক রীতিতে চারজন সহকারী সভানেত্রীসহ একজন সভানেত্রী, একজন সেক্রেটারী, একজন এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী ও একজন কোষাধ্যক্ষ থাকা আবশ্যিক। যে কোন মুসলমান মহিলাই এর সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারতেন। এর চাঁদার হার ছিল বার্ষিক কমপক্ষে তিন টাকা। ২০০ টাকা দিয়ে আজীবন সদস্য পদ লাভ করা যেত। মোট ১২ জন সভ্য নিয়ে এর কার্যকরী সভা গঠনের কথা বলা হয়। প্রতি তিন বৎসর অন্তর কার্যকরী সভার

পুনর্গঠনের কথা বলা ছিল। বাৎসরিক অন্ততঃ ৬টি সভার অধিবেশন করার কথা নিয়মাবলীতে রয়েছে। নিয়মাবলীতে বাংলাদেশের যে কোন জায়গায় শাখাসমিতি উদ্বোধনের কথা বলা আছে। অসহায় নারীদের সাহায্যকল্পে নারী শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব এই সমিতিকেই নিতে বলা হয়। নারীকে স্বনির্ভর করে তোলাই আঞ্জুমানের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে আচার, চাটনী, জেলী, মোরব্বা ইত্যাদি খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী শেখানোর ব্যবস্থা, সূচীকর্ম ও হোম নার্সিং শিক্ষা দেবার সঙ্গে বাংলা, ইংরেজী, উর্দুভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল এই সমিতিতে। এর ফলে নারী কল্যাণের আয়োজন ও কার্যকারিতা ব্যপ্ত হয়েছে বহুদূর। তাই — "নারীর সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক ও আইনগত অধিকার অনধিকার লইয়া সমিতি যে আন্দোলন করিয়াছে তাহা একেবারে নিরর্থক হয় নাই। ... ভারতবর্ষের আগামী শাসন সংস্কারে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে এই সমিতি এককভাবে এবং অন্যান্য নারী প্রতিষ্ঠানের সহিত একযোগে যথেষ্ট কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়াছে।" *(পৃ: ৩২, শামসুল মাহমুদ, ঐ)* আর এইভাবে আঞ্জুমানে খাওয়াতীনের মোহনায় রোকেয়ার জীবন এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। তাই রোকেয়া বলেছিলেন, "আঞ্জুমানের কাগজপত্র আলোচনা করিয়া দেখ, আমার কর্মজীবনের বহু কথা তাহারই মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে।" *(পৃ: ৫০, শামসুল নাহার, ঐ)*

সমাজের মধ্যে নারীর নিম্নমানের অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা, বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীর মমতা রোকেয়াকে এই সমিতির কার্যাবলীকে বিচিত্রমুখী করে তুলতে উৎসাহিত করে। এই সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তদ্‌কালীন মুসলমান পত্রিকাতে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় — "Its objects are to promote unity, social intercourse and friendly feeling among Mohamedan ladies resident in Calcutta by providing them with a common meeting ground, to better the condition of Moslem women in general by eradicating pernicious social customs and by diffusing proper and useful knowledge, and to establish and conduct and industrial school for poor and needy Mohamedan women with a view to qualify them to earn their own livehood." *('The Missalman', Vol. XIII, June 14, 1918, No. 28, P.*

27; তথ্যঋণ: পৃ: ১১৫, তাহমিনা আলম, ঐ) সমাজে নারীর জন্য যা করেছেন তার প্রতিশ্রুতি ছিল সাহিত্যে — "কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক। *(পৃ: ৩৮, স্ত্রীজাতির অবনতি, রোকেয়া রচনাবলী)* এইভাবে সাহিত্যের মধ্যে তিনি তাঁর আয়ুধগুলিকে শাণিত করেছেন। আর কর্মধারায় তাকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন।

অন্তঃপুরচারিণী মুসলিম নারীর শিক্ষাবিহীন জড়তাকে কাটিয়ে তার অশিক্ষা, অপটুতাকে সরিয়ে মুক্ত পৃথিবীর আলো, হাওয়া, শিক্ষা, স্বাধীনতার আলো দেখাতে চেয়েছিলেন বেগম রোকেয়া তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমিতির মাধ্যমে। মুসলিম সমাজের ইংরেজি শিক্ষিত যুবসমাজের মধ্যে নোয়াখালীর মৌলবী আবদুল আজীজ, মৌলবী ফজলুল করীম, মৌলবী বজলুর রহীম, বরিশালের মৌলবী হেমায়েৎ উদ্দিন, ঢাকার আবদুল খায়ের মোহাম্মদ সিদ্দিকি, ঢাকার নবাব বাহাদুর, কলকাতার সৈয়দ শামসুল হোদাসহ বহু ব্যক্তিত্ব ও ঢাকার সুহৃদ সম্মিলনীর সদস্যবৃন্দের উদ্যোগে অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বা জেনানা মিশনের প্রচলন সব মিলে সাড়া জাগানোর, নিদ্রা হরণের একটি প্রেক্ষাপট রচিত হল। 'কিন্তু ভিতর হইতে সাড়া আসিল সেদিন, যেদিন আলোকের দূতী রোকেয়ার অপূর্বপ্রাণে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল।' *(পৃ: ৪৯, শামসুল নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, ঐ)* তাঁর চেতনা 'বাঙালী, বাঙালী-মুসলমান, নারীশিক্ষা, নারীজাগরণ, তাঁর ভাবনাশীলতা এইসব কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। স্কুল প্রতিষ্ঠা, নারী কল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা এইসব তাঁর কর্মের পরিধি।' *(পৃ: ১৮, আবদুল মান্নান সৈয়দ, বেগম রোকেয়া, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২য় সংস্করণ)*

এই প্রজন্মের নারীর শিক্ষার জন্য স্কুল, কিন্তু আগের প্রজন্মের জননীদের সচেতনতার জন্য সমিতির প্রয়োজনীয়তা মুসলিম মহিলা সমাজের মধ্যে তিনিই উপলব্ধি করেন ও তাকে কার্য্যে রূপদান করেন। অর্থাৎ স্বপ্ন নির্মাণ শুধু নয় বাস্তবে নারীকে যুগ সমাজ বিশেষ করে পুরুষ সমাজের সহযোদ্ধা করার ব্রত রোকেয়ার ব্রত।

নারী কল্যাণের জন্য সমস্ত নারীকেই সচেতন হতে হবে — চিন্তা চেতনার সেই জাগরণের গভীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রহরে এসে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন অগণিত নারী — নারী-সমাজ। সেই নব জাগ্রত চেতনার থেকে সমিতি গঠন ও সমিতিতে অংশগ্রহণ অভিজাত ভদ্রমহিলাগণ

তাদের সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করেছেন। আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম সহ অন্যান্য সমিতিগুলিও নিছক ক্লাব না হয়ে সমাজ সেবার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বেগম রোকেয়ার নেতৃত্বে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' স্বদেশী আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলনের পশ্চাৎভাগে প্রেরণাস্বরূপ ছিল। নীরবে সেদিন তাঁরা স্বসমাজের জন্য প্রেরণা জুগিয়ে এসেছিলেন। "এই সমিতির সদস্যরা বাড়ির বাইরে এসে সক্রিয় ও প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন নি বটে, কিন্তু নারীজাতির মধ্যে স্বদেশী ভাবধারা প্রসারে তাঁরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সমিতির সদস্যরা চরকা কেটে প্রচুর পরিমাণ সুতো তৈরি করে খদ্দর তৈরিতে সাহায্য করেন ও বিলেতী দ্রব্য বয়কটে সমিতির কর্মীবৃন্দ প্রশংসনীয়ভাবেই অগ্রসর হন।" *(পৃ: ৪৭, এম. আব্দুর রহমান, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা, প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৮৭, প্রথম সংস্করণ)* এই সময় অন্যান্য সমিতিগুলির মধ্যে হেমপ্রভা মজুমদার 'মহিলা কর্মী সংসদ' (১৯২২) গঠন করে নারীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কাজে উৎসাহিত করে তুললেন সঙ্গে একটি মহিলা নিবাসও গড়ে তুললেন পরিত্যাক্তা নারীদের জন্য। প্রায় একই সময় আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামও একই উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল। আঞ্জুমানে খাওয়াতীনের উদ্যোগে বছরে একবার মিলাদ মহফিল অনুষ্ঠান হত। আজকের যে সর্বশিক্ষা মিশন কর্মধারা সমাজে লক্ষ্য করা যায় সে যুগে রোকেয়ার বস্তিতে গিয়ে সেখানকার নারীদের শিক্ষাদান কর্মসূচী আজকের এই চেতনারই সূচনাভূমি বলা যায়। পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ রক্ষার চেতনা দান, কুটিরশিল্পের প্রশিক্ষণ দান, স্বাস্থ্যবিধি সচেতনতা এই সমস্ত বিষয়গুলি শুধু মুসলিম সমাজে নয় ব্যাপকতর অর্থে বাংলাদেশের উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হয়। আঞ্জুমানের এই কর্মসম্ভার সমাজ ও পরিবেশ সচেতনতার ইঙ্গিত দেয়। ধর্মশিক্ষা থেকে রাজনৈতিকভাবে সজাগ থাকার কাজটিও সম্ভব হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সেই সময়কার ইতিহাসে থেকে জানা যায় ১৯১৯ সালে এই সমিতির একটি সভায় পাঁচশতের অধিক সংখ্যক মুসলিম মহিলা যোগদান করেন। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে নারী চেতনার নূতন ফলক তৈরি করেছিল। এর প্রধান কান্ডারী বেগম রোকেয়া।

স্কুল ও সমিতি স্থাপনের মধ্যে জড়িয়ে আছে রোকেয়ার কৃচ্ছ্রসাধনের ইতিহাস। রোকেয়া জীবনীকারের উদ্ধৃতি অনুসরণে বলা যায়, "প্রারম্ভে এই সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে

রোকেয়া যখন লোকের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিতেন, তখন তাঁহাকে সমাজের চোখে কতই না হেয় ও হাস্যাস্পদ হইতে হইয়াছিল। মুসলমান মেয়েরা ঘরের কোণ ছাড়িয়া সভা-সমিতিতে যোগদান করিবেন একথা তখন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। দিনের পর দিন চেষ্টা করিয়া ঘরে ঘরে গিয়া তিনি তাঁহাদের মুখের ঘোমটা খসাইলেন, হাত ধরিয়া ধরিয়া এক একজনকে ঘরের বাহির করিলেন।" *(পৃ: ৫০, শামসুল নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, প্রথম সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬)* একাকী অন্ধকার পথে কত নিন্দা-গ্লানি, কত বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া তাঁকে পথ চলতে হয়েছে তা শামসুল নাহারকে অনুসরণ করে রোকেয়ার ভাষাতেই বলতে হয় — "যদি সমাজের কাজ করিতে চাও, তবে গায়ের চামড়াকে এতখানি পুরু করিয়া লইতে হইবে যেন নিন্দা-গ্লানি, উপেক্ষা-অপমান কিছুতে তাহাকে আঘাত করিতে না পারে; মাথার খুলিকে এমন মজবুত করিয়া লইতে হইবে যেন, ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্র-বিদ্যুৎ সকলেই তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।" *(পৃ: ৫০, শামসুল নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, ঐ)*

জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য আঞ্জুমানের অবদান ইতিহাসে স্মরণীয়। বাংলার মুসলমান নারী সমাজকে তাদের দুর্গতি সম্বন্ধে সচেতন করা ও তারই সঙ্গে অধিকার আদায়ের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে সচেতন করার ক্ষেত্রে আঞ্জুমানের কণ্ঠস্বর ছিল বলিষ্ঠ। এই সমিতির হয়ে নারী সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণমূলক যে কার্যকলাপ তিনি পরিচালনা করেছিলেন তা মুসলিম নারী সমাজে মুক্তির বাতাস বয়ে এনেছিল এবং এইভাবেই সমাজে প্রগতির বার্তা ছড়িয়ে পড়েছিল। রোকেয়া পিছিয়ে পড়া মুসলিম নারী সমাজের জন্য এই সমিতি তৈরি করেছিলেন, যার একক কৃতিত্ব রোকেয়ার, শুধুই রোকেয়ার। নামের মধ্যে যে অপ্রতিরোধ্যতার বীজ লুকিয়ে আছে, কর্মধারায় তা মহীরূহে পরিণত হয়েছে। "মুসলিম নারীর জীবন ও মন আজ যেভাবে যতটুকু বিকশিত হয়েছে তার মূলেই রয়েছে বেগম রোকেয়ার আজীবনের সাধনা। একথাও আজ দিনের আলোর মত স্পষ্ট যে, কলকাতার মুসলমান নারী সমাজের উন্নতির জন্য সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল এবং আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম এই উভয় প্রতিষ্ঠান প্রভূত সহায়তা করেছে।" *(পৃ: ৫৬, মোতাহার হোসেন সুফী, বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য, সুবর্ণ, ঢাকা, জানুয়ারী, ২০০৯, প্রথম প্রকাশ)*

সাংগঠনিক ক্ষমতায় তিনি ছিলেন অসামান্যা। এই কাজে নানান অভিজ্ঞতার কথা রোকেয়ার জীবনীকারের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। যেমন — "একবার অনেক সাধ্যসাধনার ফলে নানা প্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া একটি শিক্ষিত মুসলমান পরিবারের মহিলাকে আঞ্জুমানের এক মিটিংয়ে আনা গেল। যথাসময়ে মিটিংয়ের কাজ শেষ হইল। সমবেত মহিলারা গৃহে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে নবাগতা মহিলাটি রোকেয়ার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন — 'সভার নাম করিয়া বাড়ির বাহির করিলেন, কিন্তু সভা তো দেখিতে পাইলাম না।' *(পৃ: ৫১, শামসুল নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, ঐ)* নারীর এই অচেতনতা ও অশিক্ষার রূপ দেখে সেদিন ব্যথায় রোকেয়ার বুক ভেঙ্গে গিয়েছিল। সময়ের স্রোতের বিপরীত পথ বেয়ে রোকেয়াকে পথ চলতে হয়েছিল, সাথী করতে হয়েছিল এমন নিরক্ষর মহিলাদের। বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে ক্রমে ক্রমে "রোকেয়ার চারিধারে একটি ক্ষুদ্র দল গঠিত হইল। ধীরে অতি ধীরে তাঁহারা বুঝিলেন — সভা-সমিতি কাহাকে বলে, তাঁহারা দেখিলেন নিজেদের দুর্গতি কতদূর চরমে পৌঁছিয়াছে, তাঁহারা শিখিলেন তাহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে। এক কথায় বলিতে গেলে আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে বিশ বৎসর ধরিয়া দিনের পর দিন চেষ্টার ফলে শত শত মুসলিম নারীর চক্ষু ফুটাইল।" *(পৃ: ৫২, শামসুল নাহার মাহমুদ, ঐ)* স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরতা শিক্ষাদানই আঞ্জুমানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

ধীরে ধীরে শিক্ষিত সমাজের উপর এই সমিতি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। নারীকে শুধু পুরুষের সহচরী আর পরিবারের বাঁধা ছকে — বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়ে একটি স্বতন্ত্র জগতের সন্ধান দিলেন সে যুগের অগ্রগামী নারীরা। বেগম রোকেয়া তাঁদের মধ্যে একজন। কিন্তু মুসলিম সমাজে তিনিই প্রথম, মুসলমান মহিলাদের সমাজকল্যাণ ব্রতে উদ্যোগী হতে ও মুসলমান নারীর দুঃখ দুর্দশা লাঘব করতে এবং সর্বোপরি চেতনার জাগরণ ঘটাতে সফল হয়েছিল। তিনি সেখানে আত্মমর্যাদা ও সমান অধিকার নিয়ে পুরুষের পাশে দাঁড়াতে শেখালেন, রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদারত্বের মধ্যে মেয়েদের পরিচয় পরিধিকে বিস্তৃতি দান কিভাবে করা যায় সেই শিক্ষাও দিলেন। তিনি দেখালেন সমাজ বদলাচ্ছে, তাই পারিবারিক গঠনও বদল সম্ভব। নারী শুধু নিজের স্বার্থেই নয় সমাজ বদলানোর জন্য, নারীর প্রগতিধারাকে বিস্তৃতি করার জন্য পুরুষের পাশে নিজের

স্থান করে নেবার জন্য জাগ্রত এক প্রহরীর মত সজাগ।

মুসলমান মেয়েদের মনের সীমানা বাড়ানো, চিন্তা ভাবনায় স্বচ্ছতা আনার কাজ ছিল এই আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামের। কিন্তু রোকেয়ার কাজ নিছক সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 'নিখিল ভারত মহিলা সমিতি'রও সদস্য ছিলেন রোকেয়া। তাঁর কলকাতায় বসবাসের বছর তিনেক পরেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর অন্যায়ের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। কলকাতার টাউন হলে সেই আন্দোলনের সমর্থনে একটি সভা হয়। আরেকটি সভা করেছিলেন মহিলারা — বিডন স্ট্রীটে, ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্‌টিটিউশনে। কলকাতার বিশিষ্ট মহিলারা সকলেই সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন প্রিয়ম্বদা দেবী, ছিলেন ইন্দিরা দেবী, প্রতিমা দেবী, হেমলতা দেবী, ছিলেন প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রীও ছিলেন। সেই সভায় সক্রিয়ভাবে বেগম রোকেয়ার উপস্থিতির কথা জানা যায়। "সেই সভায় যাঁরা যাঁরা প্রস্তাব করেছিলেন, তাঁরা হলেন কুমুদিনী মিত্র, প্রিয়ম্বদা দেবী, নলিনী রায় আর বেগম রোকেয়া। রোকেয়ার প্রস্তাবে, দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনকারীদের সাহায্যের জন্য প্রতিটি মহিলা সমিতিকে অর্থদান করার অনুরোধ জানানো হয়।" *(পৃ: ৭১-৭২, সুতপা ভট্টাচার্য, রোকেয়া, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৯, প্রথম প্রকাশ)*

১৯২০ সালে সম্প্রদায় নির্বিশেষে মেয়েদের একটি সভা ৬ই এপ্রিল কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়, সেই সভায় রোকেয়া শিশু পালন, শিশুর স্বাস্থ্য, শিশু প্রদর্শনী ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। শিশু পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক পরামর্শ দেবার পর এই বক্তৃতার শেষে কিন্তু তিনি শিশু মেয়ের কথা না বলে পারেন নি 'মেয়েদেরও খাওয়া-দাওয়ার একটু যত্ন করবেন। মেয়ের বিয়েতে অনেক টাকা খরচ করতে হয় বলে 'বেচারীদের শুকিয়ে মারবেন না।' আর, অবশ্যই, স্ত্রীশিক্ষার কথাও বলতে ভোলেন নি, বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধেও বলেছিলেন।

ড. লুৎফর রহমান ১৯২২ সালে 'নারীতীর্থ' নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই আশ্রমের কার্যনির্বাহক সভার সভাপতি ছিলেন বেগম রোকেয়া। যে মেয়েরা সমাজে লাঞ্ছনা পেয়েছে, সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, তাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যে আশ্রমের উদ্দেশ্য, রোকেয়া যে তার সঙ্গী হবেন তা বলার

অপেক্ষা রাখে না। ১৯২৫ সালে তিনি আমন্ত্রিত হন আলিগড়ে। সেখানকার শিক্ষা কনফারেন্সে রোকেয়া যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, একজন প্রত্যক্ষদর্শী তার যে বিবরণ দিয়েছেন তা হল : "সে বৎসর আলীগড় শিক্ষা কনফারেন্সে মেয়েদের প্রতি অন্যায় অবিচারের জন্য বম্বের আতিয়া বেগমের নেতৃত্বে মেয়েরা যে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছিলেন, সেদিনও বাংলার মুখ রক্ষা করিয়াছিলেন এ অপূর্ব মেয়েটি। পুরুষ নেতা ও অসংখ্য জনতার মধ্যে নির্ভীক পদবিক্ষেপে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া পুরুষের পক্ষপাত ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উত্তোলন, পরিশেষে নিজের অধিকার ও হক আদায় করিয়া লওয়া কম পৌরুষের কথা নয়।" *(পৃ: ৭২-৭৩, সুতপা ভট্টাচার্য, ঐ)*

১৯২৪ সালে সিউড়ীতে অবস্থিত মুসলিম বালিকা মক্তবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রোকেয়া সভানেত্রী হিসেবে আমন্ত্রিত হন। এই উপলক্ষ্যে মক্তবের সম্পাদককে তিনি একটি চিঠি লেখেন — তার অংশবিশেষ এইরকম — "I am in receipt of your letter dated the 22nd instant beg to offer my best thanks to your committee for the honour they have bestowed on me by selecting my humble self to preside at the prize distribution of your Maktab." *(পৃ: ৫১, এম. আব্দুর রহমান, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা, প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৮৭, ২য় প্রকাশ)* এই সভাতে নারীর শিক্ষা ও অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন।

১৯২৬ সালে Bengal Women's Educational Conference-এ তিনি সভানেত্রী নির্বাচিত হন। সেখানে তিনি যে ভাষণ দান করেন, সেই ভাষণটি 'সওগাত' পত্রিকা ছাড়াও প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে, চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এক মুসলমান নারীর ভাষণ এইভাবে পত্রিকায় প্রকাশ ও পরে এই অভিভাষণটি পুস্তিকাকারে বিলি হওয়ার ঘটনা সমাজে মুসলিম নারীর স্থানকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছিল। এই বিষয়ে তাঁর কৃতিত্বের কথা জানা যায় — "Muslim women gradually began to be involved with the programmes and activities of the Women's Education Conference, All Bengal Women's Conference and Bengal Women's Education League. All these asso-

ciations were founded in 1927 in Calcutta. ... R. S. Hossain, a suffragist, a feminist and a social worker, got involved with the Education League along with Saraladevi Chowdhurani, Mrinalini Sen, Kumudini Bose and others in order to press the government in enacting laws for the uplift of women." *(পৃ: ১৮১, Anowar Hossain Muslim Women's struggle for freedom in colonial Bengal (1873-1940), Progressive Publishers, Calcutta, 2003, 1st publication.)*

দেশের ও সমাজের সার্বিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করাই যদি সমাজ কর্মের সংজ্ঞা হয় তবে বেগম রোকেয়ার সমস্ত কর্মধারাই উৎসর্গীকৃত হয়েছিল সমাজের কল্যাণে। কারণ সমাজ চৈতন্যের জাগরণ রোকেয়ার সাধনা। "রোকেয়া শুধু কর্মী ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন স্বাপ্নিক। নারী জাগরণের যে অভিনব স্বপ্ন জীবনের সোনালী ঊষায় তাঁহার চোখের সম্মুখে জাগিয়াছিল, তাহাকেই বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টায় তাঁহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়।" *(পৃ: ৬২, শামসুল নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, প্রথম সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬)*

বঙ্গীয় নারী সমাজ-এর সদস্যবৃন্দ কামিনী রায়, মৃণালিনী সেন, কুমুদিনী বসু, লেডি অবলা বসু — ১৯১৭ সালে মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড কমিশনের কাছে মহিলা প্রতিনিধিদল পাঠান, যার নেতৃত্ব দেন লেডি অবলা বসু। বিষয় ছিল নারীর ভোটাধিকারের দাবী। রোকেয়াও ছিলেন নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের অন্যতম কর্মী।

রোকেয়া যে চিন্তা চেতনায় যুগের অগ্রগামী নারী ছিলেন, নানা রাজনৈতিক, সামাজিক, আইনগত অধিকার নিয়ে তিনি সরব ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় — "বিবাহ সম্পর্কিত ইংল্যান্ডীয় আইন, বিবাহ বিচ্ছেদে নারীর অধিকার, নারীর ভোটাধিকার, সমান কাজের জন্যে স্ত্রী-পুরুষের সমান পারিশ্রমিক ইত্যাদি প্রশ্নে তাঁর আধুনিক চিন্তাধারা, ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ নিরপেক্ষ।" *(পৃ: ১৫০, গোলাম মুরশিদ, রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, প্রথম প্রকাশ)*

নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনে বেগম রোকেয়ার অংশগ্রহণ — তাঁর সঙ্গে অভিজাত ব্রাহ্ম পরিবারের আলোকপ্রাপ্তা নারী সমাজ ও তাদের আন্দোলন সংগঠনের সম্পৃক্তি

নিবিড় করে। রোকেয়া সাখোয়াৎ এমন একটি নাম যিনি বারবার বঞ্চনার শিকার হয়েছেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পান নি, এমনকি স্বশিক্ষার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। তবুও এই যুগে এক দুঃসাহসিক চিন্তার উদগাতা ভারতবর্ষের পশ্চাৎপদ নারীসমাজের এক প্রতিনিধি স্থানীয় নারী বেগম রোকেয়া। তাঁর কর্মধারার মধ্যে তাঁর স্কুল — যা মুসলিম নারীদের শিক্ষার বলয়ে নিয়ে এসে তাদের নূতন পৃথিবীর আলো দেখায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমিতি — কলিকাতার মুসলমান নারী সমাজের ক্রমোন্নতি ঘটায়। গত বিশ বৎসরের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়। "এই সমিতি দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর আড়ালে মুসলমান সমাজকে কতখানি ঋণী করিয়া রাখিয়াছে।" *(পৃ: ৫০, শামসুল নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, ঐ)* আর এই সমস্ত চিন্তাধারা ও কর্মধারাকে মুসলিম সমাজের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য সাহিত্যধারার বিস্তার।

তাঁর সমাজ চেতনার প্রকাশ বিভিন্ন কর্মধারার মধ্যে। রোকেয়া নারীর অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন না করে যে স্বাবলম্বী হওয়ার কোন পথ নেই তা জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনের শুভ সূচনায় এক বর্ণময় ব্যক্তিত্বময়ী রোকেয়াই উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। এ পথ তাঁর নিজের তৈরি, এ পথে তিনিই মুসলিম সমাজে প্রথম, তাঁর যাত্রার শুরু শূন্যতা থেকে শেষ পূর্ণতায়। চেতনায় যতই তিনি যুগোত্তীর্ণা হোন না কেন, যুগ মানসিকতাকে ধরেই তাঁর যাত্রা — তাই তিনি একজন সফল সংগঠক, সফল কর্মী ও একজন সফল নারী জাগরণের অগ্রদূত।

রক্ষণশীল সামাজিক মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের সীমাবদ্ধতাতে বন্দী থেকেও পুরুষতন্ত্রের খাঁচায় বন্দী নারীমুক্তির বাতায়ন খুলে দিয়ে এবং নারীর বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলে যেসব অন্তঃপুরচারিণীরা নারী প্রগতি আন্দোলনের পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন মুসলিম সমাজের নারী বেগম রোকেয়া সাখোয়াৎ হোসেন তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। তাঁর কর্মধারার মধ্যে নারীর সচেতনতাবোধ ও নূতন মূল্যবোধের যে চেতনার জাগরণ ঘটেছিল, তাই প্রমাণ করে তাঁর সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং লড়াকু চারিত্রিক গঠন।